স্মৃতির ব্যথা

শ্রী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মাগো,

বিদায় নিয়ে এসেছিলাম অনেক আগে,
জলভরা তোর নয়ন দুটি আজও আমার বক্ষে জাগে!
আঁখির আগে সাঁজ-আকাশের ধ্রুবতারা
জ্বল্‌জ্বলিয়ে উজল হয়ে যেমন ধারা,
কিরণ-ধারার পাগল-করা পরশ দিয়ে
সারা-চোখের দৃষ্টিখানি নেয় ছিনিয়ে,
তেমনি ওগো বিদায় বেলা দৃষ্টি মা তোর
এই পলাতক মনটিরে মোর ক'রছে ভোর!

মাগো,

তোমায় ছেড়ে রইছি বটে অনেক দূরে
রংকরা এই কুঞ্জভবন বিলাসপুরে,
কালোর চাপে আলোর পরাণ ব্যথিয়ে উঠে'
দুঃখদহন লিখ্‌ছে হৃদয়-পর্ণপুটে!
থেকে থেকে চম্‌কে উঠে হারাই দিশা
তোমার পথের নাগাল খুঁজি দিবস নিশা।
মন ছুটে যায় আমন ধানের ক্ষেতের ফাঁকে
নাবাল জমির আল-পথেরই বাঁকে বাঁকে,
আম-বাগানের শীতল হাওয়ার সঞ্চরণে,
ফাগুন-বনের মৌমাছিদের গুঞ্জরণে;
কোকিল-ডাকা মধুমাখা বকুল-তলায়
ঘরে ফেরার গান গাহে যে ছোট্ট গলায়,
চিনি চিনি তারেও যেন, তোমার সাথে
দেখেছিনু এক শরতের জোৎস্না রাতে।

কণ্ঠে ছিল বকুল ফুলের বিনোদ মালা,
নূতন ধানের মঞ্জরীতে সাজিয়ে ডালা
সবার মাঝে খুঁজ্‌তেছিল একটি জনে—
থেকে থেকে সেই কথা আজ পড়ছে মনে।
তোমার ফুলের গন্ধমধু দখিণ হাওয়া,
নদীর কূলে আপন ভুলে অধীর চাওয়া,
জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে গেছে দেহে মনে—
তারই স্মৃতি জাগায় ব্যথা ক্ষণে ক্ষণে।
হ্যাঁ মা, তুমি বল্‌তে পার মোর আঙ্গিনায়
তেমনি করে যায় কি বয়ে দক্ষিণা বায় ?
গাঁয়ের শোভা অশোক চাঁপা জুঁই কি বকুল
তেমনি করে উঠ্‌ছে ফুটে গন্ধে আকুল ?
তালপুকুরের অথৈ জলে সাঁতার খেলা
আনন্দ-গান কলধ্বনি যাবার বেলা,
তুলসীতলায় সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ খানি
তেমনি করে দেয় কি ধরে জ্বালিয়ে আনি ?

মাগো,

তোমার শোভা মনোলোভা তোমার গেহ,
তোমার মায়া, শ্যামলছায়া, অপার স্নেহ,
আজকে আমার মন টানে যে সবার মাঝে,
তোর ব্যথা যে বজ্র সম বক্ষে বাজে,
বিদায় নিয়ে আর ত তোমার পাইনি দেখা,
চোখের জলে দিন চলে যায়,—ভাগ্যলেখা !
এই জীবনের সব সাধনা অর্ঘ্যভারে
উজাড় করে দিতে যে চাই নিত্য তারে।
সে আমারে লুকিয়ে বেড়ায় কোথায় মাগো,
তারে ছেড়ে দিন যে আমার চল্‌ছে নাগো।

মাটির ঢেলা

শ্রী প্রবোধকুমার সান্ন্যাল

পথ দিয়া গেলে লোকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। শূন্য একটা পিপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিলে যেমন দেখায়,—ঠিক তেমনি। দেখিতে দেখিতে লোকের পেটের ভিতর হাসি ফেনাইয়া ওঠে।

দুবেলা বাসন মাজে, বাড়ীখানা ধুইয়া দেয়, আর এটা-ওটা! এইত কাজ! বাজার করিতেও হয় না। পয়সা হাতে পড়িলে সে নাকি আর ছাড়িতে চায় না—সেই কারণে!

দোকানীরা বলে, এসো না বাপু তুমি, দোকানের এখনও বউনি হয়নি—যাও, উই ছাতুখোর বেটার দোকান থেকে মুড়ি কেনো গে যাও!

ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সকলের দিকে চায়; তারপর ওই একটুখানি হাসিয়া তেমনি করিয়া থপ্-থপ্ করিতে করিতে ছাতুখোরের দোকানের দিকে চলে।

দোকানী বিড়-বিড় করিয়া বলে, হতচ্ছাড়া মাগির ঠ্যাসে-ঠ্যাসে চলা দেখ!

ছোটুলাল বাঙ্গলায় বলে, ছাত্তু লেবি এই-মাগী, আবার এসিয়েছে—বলিয়া কাঠের হাতলটা দিয়া তাহার গালে একটা ঠোনা দেয়।

আঁচল হইতে পয়সা বাহির করিয়া একটু হাসিয়া সে বলে, মুড়ি দাও! একটা লঙ্কাও দিও,—আর ছুটি ছোলাসেদ্ধ ফাউ! দাও এই হাতে। বলিয়া বাঁ হাতটা পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

ছটু হাসিতে হাসিতে ছুটি ছোলাসিদ্ধ তাহার হাতে দেয়, তারপর মাটি-পোরা একটি কুনকের তিন কুনকে মুড়ি তাহার আঁচলে ঢালিয়া দিয়া বলে, যা ঘর যা, পালা—। মুড়ি ফাউ আর সে দেয় না।

সে বলে, দাঁড়া না ভাই, যাচ্ছি! তাড়াস কেন? বলিয়া ছটুলালের দিকে হি হি করিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়। খানিকদূর গিয়া আপন মনে বলে, ছটুলালটা ভারী বজ্জাত! কি সব বলে......হাসতে হাসতে পেটে আমার খিল ধরে। বলিয়া ঠোঙা হইতে এক আঁচলা মুড়ি গালে পুরিয়া চিবাইতে থাকে।

লোকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়।

খেঁদা বলে, সর্ লো সর্ অমন রাস্তা লেপ্টে দাঁড়িয়ে থাকিস্নে। বলিয়া একটা ঠেলা দেয়।

বয়সও নেহাৎ অল্প নয়,—পঁচিশ পার হইয়া গেছে, কিন্তু হাসিটুকু এখনও যায় নাই। সাদা থান কাপড়খানি পরিয়া কাজকর্ম্ম করে, কিন্তু বিকাল বেলা লালপেড়ে সাড়ীখানি পরা চাই-ই চাই। কপালে একটা টিপ লাগায়, আবার মাথায় সিঁথিতেও সিঁদুর দেওয়া হয়, কিন্তু নিজের খেয়ালে আবার কখন সেটুকু মুছিয়া ফেলে।

বদির মা তাহা দেখিয়া বলে, অ-তরুবালা শুন্‌চিস্?

সে মুখ ফিরায়।

কথায় কথায় তোর বর মরে বাঁচে নাকি?

তরুবালা বলে, বাঁচেই ত! জান বদির মা, সে ছিল......। এমনি এমনি। আমার চেয়ে মাথায় বড়—ঐ অতখানি! চোখ মুখ টানা টানা...বলিয়া হাত দিয়া শাড়ী কাপড়খানির ধূলা ঝাড়িয়া লইয়া ভব্য হইয়া বসে।

বদির মা মুখ টিপিয়া হাসে। পুনরায় বলে, কোথায় গেল সে?

তরুবালা বেশ গম্ভীর হইয়া বলে, আছে আসবে 'খন দেখবে। বলিয়া গলির মোড়ে রাস্তার দিকে চায়। ত্রস্ত ব্যাকুল দৃষ্টি কাহাকে খোঁজে!

কিন্তু কেউ আসে না। ঘর্ ঘর্ করিয়া গাড়ী ঘোড়া তাহার চোখের উপর দিয়া তীর বেগে দুধারে ছুটিয়া চলে। রাস্তায় একে একে আলো জ্বলিয়া ওঠে। খেঁদা ছাতি বগলে করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

তরুবালা ঘরে উঠিয়া যায়। সাড়ীখানি ছাড়িয়া সযত্নে তুলিয়া রাখে। তারপর হঠাৎ কুলুঙ্গীর দিকে নজর করিয়া বলে, ওই যা! পানটা ত খাওয়া হয়নি!—বলিয়া পানটা নাড়িয়া-চাড়িয়া রাখিয়া দিয়া বলে, কাল বিকেলে খাব, আজ থাকুক্।

খগেনের আফিংয়ের দোকান। নিজেই কেনা-বেচা করে। পাঁচুকে আজকাল আর দোকানে পাঠায় না। কাঁচা পয়সা চুরি করিয়া উচ্ছন্ন দেয়।

খগেন মুখ খিঁচাইয়া বলে, শালার বেটা শালার বয়েস কুড়ি পেরিয়ে গেল, জ্ঞান হ'ল না। বাইরের পয়সা ত কই ঘরে আন্‌তে পাল্লিনে? যত মধু ওই বাপের ইয়েতে—কেমন?

পাঁচু চুপ করিয়া থাকে। মিট্ মিট্ করিয়া চায়, দেখে বাপ তাহার চলিয়া গেল কিনা!

খগেন আরও রাগিয়া বলে, গয়লা-বৌয়ের কাছে সেদিন প্যাদানি হয়েছিল—বেশ হয়েছিল। বেটা এমন চুরি কল্লি যে ধরা পড়ে' গেলি! বাপ-পিতমোর নাম ডুব্‌ল' যে হতভাগা! বলিয়া উড়ানীখানা কাঁধে ফেলিয়া গর-গর করিয়া চলিয়া যায়।

পথ আগলাইয়া তরুবালা বলে, আজ নোলকটা আনবে গা?

খগেনবাবু কটমট করিয়া চায়। কিন্তু তরুবালা তাহা দেখিয়া হি হি করিয়া হাসে।

খগেনবাবু বলে, নোলক আন্‌ব না ইয়ে আন্‌ব—আবাগি কোথাকার! সব তাড়াব একে একে দাঁড়াও! বড্ড মাথায় উঠে গেছে—নে সর—

তরুবালা সরে না। বলে, তবে একখানা চিরুণী? বলিয়া আবার হাসে।

আচ্ছা, তাই হবে। বলিয়া খগেন চলিয়া যায়। খানিক দূর গিয়া আপন মনেই বলে, মাগি এমনি তর ছ্যাপান্‌প্যানা করে আমার সঙ্গে,—লোকে কি সব মনে করে বল দিকি?

তরুবালা ততক্ষণে বদ্দির মার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দেয়। হঠাৎ বলে আজ আমাদের বিয়ে হবে গো—

বদ্দির মা বলে, আ মর্! কার সঙ্গে বিয়ে?

খিল্ খিল্ করিয়া তরুবালা হাসিয়া আড়ালে চলিয়া যায়। তারপর একটুখানি মুখ বাহির করিয়া বলে, ওই ত খগেনবাবু চলে গেল।—

পাঁচু তাহাকে পিছন হইতে ঠেলিয়া দিয়া বলে, যাও আমার ঘর থেকে! এ-ঘরে মেয়ে-মানুষ আসা পছন্দ করি না।

তরুবালার মুখের হাসি শুকাইয়া যায়। শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে, আর আসব না।

বড় বড় চোখে পাঁচুর ঘরের দিকে তাকায়—বলে, কি করে' চায় আমার দিকে, দেখ্‌লে ভয় করে!

আবার তখনই সে কথা ভুলিয়া যায়। আপন মনে আবার হাসে।

পাঁচু সেই অন্ধকার ঘরে ভাঙ্গা তক্তাটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলে, ওকে রাখা কেন? কি দরকার? ওর থেকে লাভ কি? বলিয়া আফিংয়ের গুলিটা মুখে পুরিয়া এক ঢোক জল খায়। তারপর বলে, বাপ বলে' কি আমার চেয়েও চালাক? কিছু বুঝিনি? বলিয়া উঠিয়া যায়। বাপের হুঁকাটা লইয়া এক ছিলিম তামাক সাজিতে বসে।

অত বেলায় পাঁচ পাত কুড়াইয়া জড়ো করিল—ডালে তরকারিতে ভাতগুলা মাখামাখি। তাহাই একখানি থালায় তুলিয়া দরজাটির কাছে বসিল। তারপর হঠাৎ একবার ছুটিয়া নিজের কোটরে গিয়া ছোট্ট আরসীখানি হাতে করিয়া বলিল, এইবার—এমনি—এমনি হবে! বলিয়া আয়নায় প্রতিফলিত হু'টি ঠোঁটে বার-তিনেক হাত ঠেকাইয়া একটু একটু হাসিতে লাগিল।

পিছন হইতে পাঁচু বলিল, কি হচ্ছে?

তরুবালার হাসি ম্লান হইয়া আসিল। আরসীখানি দেখাইয়া বলিল, এই যে—দেখছি।

পাঁচু আজকাল প্রায়ই তাহাকে ঠাট্টা করে। বলিল, মুখ দেখা হচ্ছে বুঝি?

মুখ দেখছি—হুঁ—ভাত খাব যে—! দেখবে? বলিয়া পাঁচুর হাতের কাছে ভয়ে ভয়ে সে আরসীখানি বাড়াইয়া ধরিল।

হাতের বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া পাঁচু একটু হাসিল। তারপর একবার দরজার দিকে চাহিয়া বলিল, কি সব ভাত তরকারি জড়ো করেচিস? বলিয়া তাহার পিঠে একটা গোঁজা দিয়া বলিল, যাও, বেশ মুখ দেখা হয়েছে—এইবার খাওগে! মুখ দিয়ে ত রস গড়াচ্ছে—

তরুবালা বাহির হইয়া গেল। পাঁচু আবার একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল, আর একটু রোগা হলে তরুটাকে বেশ দেখতে হ'ত। বলিয়া বিড়িতে আর একটা টান দিয়া পুনরায় বলিল, ছাই হ'তো!

সাড়ী কাপড়খানিকে চোখের আড়াল করিতে পারে না। দিনান্তে শতবার ধুলা ঝাড়িয়া গোছ করিয়া রাখে। ছাদে শুকাইতে দিয়া সুমুখে বসিয়া থাকে ও সেইদিকে চাহিয়া গুণ গুণ করিয়া গান গায়।

ওই কাপড়খানির জন্যই যেন সংসারে সে বাঁচিয়া আছে!

খাইতে বলিলে খায়, শুইতে বলিলে শোয়। বাঁচিবার গরজ তাহার নিজের যেন কিছুই নাই।

পাঁচু তাহাকে দেখিলেই বলে, সাড়ী কই তোর? নতুন সাড়ী? বলিয়া হাসিতে হাসিতে শিষ্ দিয়া চলিয়া যায়।

রহস্য-পুরীর পাষাণ শিলায় অনুভূতির তরঙ্গ আছড়াইয়া পড়ে—যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়।

পাঁচুর সে চাউনি দেখিলে তাহার ভিতরে ভিতরে কাঁপুনি ধরে। জাল দেখিলে হরিণীর যেমন আতঙ্ক হয়।

তবু মুখ ফুটে না; মনে হয় নিজেরই ভুল। বিশ্বাস করিবেই বা কে!

আবার সব ঘুলাইয়া যায়। সাড়ী কাপড়ের আঁচলটা চোখের সামনে পত্‌পত্‌ করিয়া ওড়ে! চুল কুলাইতে কুলাইতে বলে, ওই যা! আজ যে পান সেজে রাখা হয় নি! বলিয়া কাপড়খানা বগল-দাবা করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গিয়া পান সাজিতে বসে।

সন্ধ্যার পর গাড়ুটা দেয়ালের কাছে রাখিয়া খগেনবাবু বলে, তামাক দেরে—

তামাক লইয়া তরুবালা আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে—ডাক শুনিবার অপেক্ষায়। তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া খগেন-বাবুর হাতে হুঁকাটা দিয়া সেইখানেই হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়ে।

আপন মনে বাবুর পা দুইটা কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া টিপিতে থাকে।

খগেনবাবু তামাকে টান দিয়া বলে, তোকে ত আমি ঝি'র মতন দেখিনি, নিজেদের মতন করেই রাখি। তুই বেটি ওই যে মাঝে মাঝে বেয়াড়ামো করিস, ওইতে রাগ হয়—

তরু আবার হাসে। মাথার চারটি চুল খগেনের পায়ের উপর ছড়াইয়া পড়ে।

নেপথ্যে গিন্নির গলা শোনা যায়।

খগেনবাবু একটু কাসিয়া বলে, পাঁচু কই গা?

ভীতিব্যাকুল দৃষ্টিতে তরুবালা এদিক-ওদিক চায়। খগেনবাবু সরিয়া বসে।

তরু বলে, বাড়ী নেই, বাড়ী নেই আমি জানি—। আরও কি বলিতে যায়—পারে না। বলিবার ভাষা কুলায় না।

ছোট আরসীখানি সুমুখে রাখিয়া খোঁপা বাঁধিতেছিল। পাঁচু আড়াল হইতে সরিয়া আসিয়া বলিল, খোঁপা বেঁধে কি হবে, দেখবে কে?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলে হাত-পা চলে না। তবু একটু হাসিয়া তরুবালা বলিল, খোঁপা বাঁধছি—অমনি—

পাঁচু এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, তোমার বিয়ে হয়েছিল তরুবালা ?

তরুবালার সে কথা মনে নাই। বলিল, কবে ?

হিঁ হি করিয়া পাঁচু হাসিল, বলিল, কবে তা আমি কি জানি !

তবে হয়নি—বলিয়া তরুবালা একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল, একদিন হবে, ওই বদ্দি-মা বলছিল—ও বড্ড হাসে—

পাঁচুর সে কথা শুনিবার প্রয়োজন ছিল না। একবার উঁকি মারিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। তারপর সরিয়া আসিয়া বলিল, একটা কথা বলব শুনবে ?

'উঁ' বলিয়া তরুবালা উদাসদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইল।

হুঁ। আচ্ছা থাকৃগে। বলিয়া পাঁচু একবার বাহিরে চলিয়া গেল। আবার তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তোমায় কিন্তু দেখতে বেশ তরু—

তরু চুপ করিয়া তখনও হাসিতেছিল। হঠাৎ বলিল, আরও—আরও ভাল দেখতে ছিলুম—বুঝলে ? আরও ভাল। খু—ব......

তা দেখতেই পাচ্ছি। বলিয়া তাহার চিবুকটা নাড়িয়া দিয়া পাঁচু হন্ হন্ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

খাইতে বসিয়া খগেন বলে, মুখের দিকে অমন ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে আছিস্ কেন রে ? খাওয়া দেখছিস বুঝি ?

তরুবালা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলে, দেখছি ত—অত ক'টি ভাত খাও তুমি ? আমি এত......বলিয়া নিজের আহারের পরিমাণটা দেখাইয়া দেয়।

গিন্নী বলেন, পথ ছেড়ে বস্ বাপু, তোর ও আদিখ্যেতা ভাল লাগে না। আবার একটু থামিয়া বলে, যা, উঠে যা ওখান থেকে—মানুষকে খেতে দে। অত মাখামাখি কেন ?

খগেন বাবু বলে, থাম না গা ! চুপ করে বসে রয়েছে, থাকুক্ না কেন !

গিন্নী গর্ গর্ করিয়া বলে, থাকবে থাকুক,—আমিই চলে যাচ্ছি। বলিয়া হঠাৎ স্বামীর পিঠে একটা আঙ্গুলের টিপ দিয়া গিন্নী বলে, ওই দেখ ওই মুখ দিয়ে দরানি গড়াচ্ছে—খেতে খেতে চেয়ে দেখলে ঘেন্না করেনা ? বলিয়া কাছে গিয়া গিন্নী চোখ পাকাইয়া বলে, যা উঠে যা—আবাগি ! পাগল ছাগলের একগুণ বেশী !

তরুবালা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া যায়। ঘরের ভিতর গিয়া জানলার ধারে বসিয়া গান ধরে,—'ভালবাসি চাঁপাফুল—'

পাশের ঘরে পাঁচু বসিয়া তাহার গান শুনিতে শুনিতে এদিক ওদিক তাকায়।

খানিকবাদে উঠিয়া খগেন বাবুর চটি জুতা জোড়াটি আঁচল দিয়া মুছিয়া রাখে।

খগেনবাবু তাহা পায় দিয়া দোরের কাছে আসিতেই সে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া বলে, আজ চিরুণী আনবে ?

তাহার মাথার চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া খগেনবাবু একটু হাসিয়া বলে, চুল কই যে চিরুণী দিবি মুখপুড়ী ?

তরু আবার বলে, আন্‌বে বল ?

সর্ সর্, বেলা গেছে, দশটার সময় দোকান খোলবার কথা—

কিন্তু তরু ছাড়েনা। ঠোঁট দুইটির কাছে কাছে অবজ্ঞাত অন্তরাত্মার সমস্ত ইতিহাসটি গুঞ্জন করিয়া ওঠে। সারা জীবনটিতে যে কথা অব্যক্ত রহিয়া গেছে তাহাই বলিবার চেষ্টায় মুখ তুলিয়া ধরে, কিন্তু তবুও বলিতে পারে না। নিমেষে সমস্ত হারাইয়া যায়। আস্তে আস্তে বলে, আন্‌বে বল ?

আন্‌ব, আন্‌ব। বলিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া খগেন বাবু বাহির হইয়া যায়।

তরুবালা একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া থাকে। চোখে জলও আসে।

কথার প্যাঁচে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। পাঁচুর মনের কথা বুঝিতে পারেনা। যখন তখন পাঁচুকে দেখিয়া বলে, আরও ভাল দেখতে ছিলুম—বুঝলে?

পাঁচু তামাক টানিতে টানিতে হাসে, বলে, তোমার চুল আরও কালো ছিল, না তরু?

তরু চুলের রাশ লইয়া দেখে। মুখের উপর চুলগুলি ঝাঁপাইয়া পড়ে। বলে, ছিলইত, আরও অনেক বড় বড় —বদিমা বলে—। বলিয়া হাসে।

আগেকার সে আতঙ্ক মন হইতে মুছিয়া গেছে। নির্জ্জনে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেও তাহার বাধে না। পাঁচু চিবুক্ ধরিয়া নাড়িয়া দিলেও চুপ করিয়া থাকে। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চায়, আবার কখনও ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে।

ছাদের পাঁচিলের কাছে বসিয়া রৌদ্রে চুল শুকাইতেছিল। সেদিকে একবার উঁকি মারিয়া পাঁচু ছোট বোনটাকে বলিল, মা কোথায় রে?

গঙ্গা নাইতে—সে বলিল।

পাঁচু ছাদের কাছে সরিয়া গেল। নিকটে গিয়া বলিল, নিজের তদ্বির করতেই ত সারাদিন গেল—

তরুবালা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল। সেই পুরাতন গানটার একটা কলিও আস্তে আস্তে গাহিল, ভালবাসি। চাঁপাফুল—'। তারপর হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা মানুষ মরে যায়, আবার ফিরে জন্মে? কই, বল দেখি? বদিমা বলে, ভূত হয়।

পাঁচু পিছন ফিরিয়া ছোট বোনটাকে বলিল, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

সে চলিয়া যাইতেই পাঁচু সরিয়া আসিয়া বলিল, ওসব কথা ভেবে কি হবে তরু?

ভাবব না?—আচ্ছা।

তোমার বুঝি কিছু ভাল লাগে না?

তরু মুখ ফিরাইয়া নিরর্থক হাসি হাসিল। তারপর বলিল, খুব লাগে। বদিমা বলছিল—

পাঁচু সরিয়া আসিয়া তাহার আঁচলের খুটটা লইয়া হাতের মধ্যে পাকাইতে পাকাইতে বলিল, তরুবালা।

তরুবালা মুখ তুলিল।

ক্রূর সর্পের মত চাহিয়া পাঁচু একটু হাসিয়া বলিল, একটা কথা বলব—রাখবে?

কি কথা তরু তাহা বুঝিল না। বলিল, খুব রাখব। যা বলবে তাই শুনব।

পাঁচু তাহার একটা হাত খপ্ করিয়া ধরিয়া বলিল, সত্যি তোমায় আমার খুব ভাল লাগে। শুনবে?

হাঁ শুনব—খুব শুনব। বলিয়া তরু হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

ছোট মেয়েটা হাত পা নাড়িয়া মাকে কি সব বলিয়া দিয়াছে।

তাই হঠাৎ গেল কাল রাত্তেই পাঁচু বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় পলাইয়া গেছে।

আশপাশে কানাকানি চলিতেছিল।

বদির মা জানলায় মুখ বাড়াইয়া কি সব বলিয়া গেল... আগুন আর ঘি......

মার খাইয়া গায়ে পিঠে দড়া দাগ বসিয়া গেছে। মেয়েটা যন্ত্রণায় সারা সকাল ছটফট করিয়াছে।

পাঁচুকে খোঁজাখুজি করা হইয়াছে, কিন্তু পাওয়া যায় নাই। গিন্নী কাঁদিতেছেন। রাগটা তরুবালার উপর।

খগেনবাবুর রাগ তখনও যায় নাই। কুটুরী হইতে চুলের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে সুমুখে আনিয়া মার। হারামজাদী!—আবার পিঠে এক চাপড়!

গিন্নী অগ্নিমুখী হইয়া কাঁচি আনিয়া তাহার চুল কাটিয়া দিল।

খগেনবাবু মুখে কিছু বলিল না। চটি জুতা দিয়া আবার ঘা কতক বসাইয়া দিল।

মার খাইয়া পলাইতেও জানে না। ঠোঁটের উপর দাঁত চাপিয়া বসিয়া থাকে, ছোট মেয়ের মতন।

কি দোষ যে করিয়াছে তাহা মনেই পড়ে না। কালকার কথা আজ তাহার মনে থাকেই বা কেমন করিয়া? পাঁচু বাড়ী নাই এই কথাই জানে। কিন্তু তাহার জন্য সে মার খায় কেন?

চুলগুলাও কাটিয়া লইল! কি আর হইবে? খানিক-ক্ষণ বাদে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সাড়ী কাপড়খানি তখন ধুলায় লুটাইতেছে।

সেখানিকে তুলিয়া লইয়া শশব্যস্তে ঝাঁপিতে লাগিল। আজ সকাল হইতে সে ইহার খোঁজ লয় নাই!

চোখ দিয়া তখন টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। কাপড়খানি বুকে করিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গিন্নী বলেন, তাড়াও ওকে!

খগেনবাবু বলিল, হাঁ, তাড়াও—

মুখে বললে হবে না, ওই দেখ দাঁড়িয়ে…

খগেনবাবু জুতা লইয়া তাড়া করিলেন।

গিন্নী বলিলেন, মারো, মারো—ন্যাকা সাজ্‌ছ কেন? সে অপমান সওয়া দায়!

হাতের জুতা তরুবালার পিঠের উপর ছিঁড়িয়া গেল!

বেদনায় তরুবালা কেঁচোর মত পিঠমোড়া খায়, চোখ দিয়া দর্‌দর্ করিয়া জল পড়ে, আর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে তাকায়।

সে চাহনির যেন মানে আছে!

গিন্নীর লাথি খাইয়া সে রাস্তায় গিয়া পড়ে।

উঠিয়া আবার চলিতে থাকে।

গিন্নী বলে, সাড়ী দিয়ে যা মাগী, সাড়ী দিয়ে যা।

ফিরিয়া আসিয়া সাড়ীটি দরজার কাছে নামাইয়া দেয়।

বেরো এবার!

মেয়েটা এদিক-ওদিক তাকায়। খগেনবাবুকে আর দেখিতে পায় না। তখন সে ওঠে। উঠিয়া চলিতে থাকে।

চলে আবার ফিরিয়া চায়। আবার চলে।

কতদিন চলিয়া গেছে। পাঁচু ঘরে ফিরিয়াছে। কিন্তু তরু আর আসে না।

রাস্তায় খগেনবাবুকে দেখিয়া একদিন সে পায়ের ধুলা লইয়াছিল।

গায়ে কাপড়ও নাই। লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরায়।

রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। যা' তা' বকে। লোকের বাড়ী ভোজ-কাজে এঁটো পাতের কাছে গিয়া শুকুনীর মত জায়গা জুড়িয়া বসে।

স্ত্রীলোককে চলিতে দেখিলেই বলে, আমার কাপড়-খানা পরেছ? আবার বলে, ওদের বাড়ী কাজ কর নাকি?

কখনও গান ধরিয়া দেয়, 'ভালবাসি চাঁপাফুল'—

আশ্বিন নব-আশ্বিন মোর—

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

আশ্বিন নব-আশ্বিন মোর শরতের শেষ মাঝি,
তব অঞ্জলি পুটে বল আর কি গান রাখিব আজি!
প্রথম পরাগ ধুয়ে গেছে সেই আষাঢ়ের বরষায়;
আর যাহা ছিল উড়ে গেল হায় শেষ-বাদলের বায়;
আর-ফাগুনের আগুন-গানের যেটুকু রয়েছে বাকি
সেযে ক'টি শুধু শুকানো পত্র শুধু মলা শুধু ফাঁকি!
কহ মোরে কহ নব-আশ্বিন—শরতের শেষ মাঝি,
আজি অঞ্জলি পুটে তব আর কি দিয়ে সাজাই সাজি!
তবে আশ্বিন নব-আশ্বিন শরতের শেষ মাঝি,
যদি লও তবে রচিবারে পারি নূতন গীতিকা আজি।
কাঙাল কাশের গুছি লয়ে আর কাঠ-গোলাপের ফুলে,
গাঁথি গানখানি শিশিরে ভিজায়ে ঝরা শেফালির মূলে,
নূতন নীপের ব্যাকুলতা তাহে নূতন তৃণের ভাষা—
আর তাহে থাক্ নব গগনের নীল অনন্ত আশা!
আশ্বিন নব-আশ্বিন মোর শরতের শেষ মাঝি,
করপুটে তব দিতে পারি শুধু এই গানখানি আজি!

——

আধুনিক ফরাসী সাহিত্য

রিচার্ড ব্লক

ভূমিকম্পের সময় ভূতত্ত্ববিদের অনুসন্ধিৎসা কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু ভূগোলতত্ত্ববিদের পক্ষে সে সময় সুস্থ ও শান্তচিত্তে কোনো দেশের মানচিত্রে মনোনিবেশ করা প্রশস্ত নয়। সুতরাং আমি যদি এখন আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের ধারাগুলির একটা মোটামুটি পরিচয় দিতে যাই তাহা হইলে তাহা নিতান্ত সহজসাধ্য না হইবারই কথা।

চিত্তে ও চিন্তায় আজ আমাদের বিপ্লব। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়াই আমাদের জীবন-তরণী বাহিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছি।

সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে অনুসন্ধান করিলে এই বিপ্লবের কতকগুলি কারণ, কতকগুলি ঘটনার পারম্পর্য্য প্রকাশিত হয়।

ফরাসী সাহিত্যে বহুকাল যাবৎ দুইটি স্রোতধারা

পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে তাহাদের মূলেও পৌছান যায়।

একটি ধারায় বেগবতী মহানদীর প্রবল কল্লোল,—তাহাতে কর্দ্দম আছে, উদ্দামতা আছে, বাহিরের প্রভাব আছে, সৃষ্টি-শক্তির প্রাচুর্য্য আছে—তাহা রাবেলে কর্ণেই, দিদেরো, রুশো, শঁতোব্রিয়াঁ, ভিক্টর হিউগো, মিশেলে, বালজাক্ এবং জোলার দানে উপচিত। অপর ধারাটি একটি নির্ম্মলা ক্ষুদ্র প্রবাহিনী,—তাহাতে একটি অপূর্ব্ব সসীমতা ও অতুলনীয় স্বচ্ছতা আছে,—তাহা মধ্যযুগের প্রাচীন কাহিনী হইতে উৎসারিত হইয়া ভিলঁ, দ্যু বেল্যে, রন্সার্দ, রেসিন্, ভল্তেয়ার্ ও মুশের দ্বারা পুষ্ট হইয়া আজ মরাস্ এবং আনাতোল ফ্রাঁসকে জন্ম দিয়াছে।

অবশ্য এইরূপ শ্রেণীবিভাগ স্বাভাবিক নয়। যে-সকল স্রষ্টা-শিল্পী জাতীয় ও অন্যান্য উৎস হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন, এইরূপ শ্রেণীবিভাগ দ্বারা তাঁহাদের উপর অবিচার করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সপ্তদশ শতাব্দীর মলিয়রকে আমরা লইতে পারি। রাবেলে ও কর্ণেইর নিপীড়িত আত্মার প্রভাব ও সমসাময়িক সমালোচক বোয়ালো ও নাটককার রেসিনের প্রভাব দ্বারা মলিয়ার প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার রচনা-ভঙ্গী সুন্দর এবং অন্তরের কলরোল শান্ত হইতে পারিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভাবান কবি বোদ্‌লেয়ারের মধ্যেও এই সংযম লাভের চেষ্টা দেখিতে পাই। বোদ্‌লেয়ারের প্রতিভা যখন মধ্যাহ্নকালে উপনীত, ফরাসী সাহিত্যে তখন হিউগোর অশান্ত আলোড়ন চলিতেছে। বোদ্‌লেয়ারের প্রতিভা কিছু কম উদ্দাম ছিলনা,—অদৃষ্টের পীড়ন, অন্তরের আর্ত্তনাদ তাঁহাকে কম চঞ্চল, কম উদ্‌ভ্রান্ত করে নাই। কিন্তু তবু তাঁহার কবিতার মধ্যে সেই যুগের মহারথীদের প্রেরণার মিশ্রিত ধারার বিরুদ্ধেই প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই। বোদ্‌লেয়ার অন্তরে রোমাণ্টিক, কিন্তু বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছেন ক্লাসিকের আকারে।

বোদ্‌লেয়ার যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছেন ফরাসী সাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্যটুকু বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। এই বিশিষ্টতার মধ্যেই ফরাসী সাহিত্যের উর্ব্বরতা ও নব নব পন্থা-সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতা বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ নবীন শিল্পী তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের বন্ধন সহ্য করিতে পারেন না। এই বন্ধন অস্বীকার করা ফরাসী জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রবেশ করিয়াছে। সেইজন্য দেখিতে পাই উদারতা ও বন্ধন-মুক্তি যে যুগের ধর্ম্ম, ঠিক তাহার পরবর্ত্তী যুগের আবার ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ও রাজনীতিক রক্ষণশীলতা বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই দুই বিপরীতমুখী মনোবৃত্তির উত্থান পতনের মধ্যেই ফরাসী জাতির সাধনার ছন্দ ও ছাপ নিহিত আছে।

যে দুইটি পাশাপাশি ধারার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার ফল জাতীয় সাহিত্যের উপর একই সময়ে বর্ত্তায় না,—এই বিভিন্ন মনোভাব দুইটি পরস্পরকে অনুসরণ করিয়া চলে। যখন কর্ণেইর শব্দমুখরতায় ফরাসী চিত্ত শ্রান্ত হইয়া পড়ে তখনি রেসিনের কাব্য-মাধুর্য্যের দিকে সে তাহার মুখ ফিরাইয়া লয়। ফরাসী চিত্ত ও প্রকৃতির এই উদ্দামতা ও সম্পূর্ণতার খোঁজ না রাখিলে ফরাসী জাতি ও আর্টকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। বিদেশীয়েরা এই ভুল প্রায়ই করিয়া থাকেন।

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের দুর্দ্দিনে ফরাসী সাহিত্যে একটা চমক লাগিল। তখন গল্পসাহিত্যকারদিগের দুইটি আলাদা দল ছিল। একদল আধুনিক সভ্যতার উচ্ছলতার মধ্যেও সেই স্বচ্ছতোয়া ক্লাসিক স্রোতস্বিনীতেই অবগাহন করিতেছিলেন,—সেই বিশুদ্ধ ভাষা, সংযত বোধ-শক্তি, প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি এবং গভীর সাধারণ জ্ঞানেরই পূজারী ছিলেন। এই দলের প্রতিনিধিদিগের মধ্যে আনাতোল ফ্রাঁস, লেমাতর্, মরাস এবং রেনাদের্র নাম করিতে পারি।

অপর দলের প্রতিনিধি পেগুই, সুয়ারে এবং রোমাঁ রোঁলা,—তাঁহাদের মধ্যে মহানদীর সেই উদ্দাম তরঙ্গ। ইঁহারা একটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন দল। ইঁহাদের প্রতিভাই ইঁহাদিগকে আর দশজনের চাইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। রোঁলার 'জ্যাঁ ক্রিস্তফের' কথা বিশেষ

করিয়া উল্লেখ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই—ইহার খ্যাতি সমস্ত জগৎময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে,—বাংলাতেও ইহার অনুবাদ হইতেছে। যাঁহারা পেগুই এবং স্যুয়ারের সঙ্গে পরিচিত হইতে চান তাঁহাদিগকে 'আওয়ার ইউথ্' এবং 'ট্রাজিক পোয়েটস্' পড়িতে অনুরোধ করি।

ক্লাসিক ও রোমাণ্টিকদিগের মাঝামাঝি স্থান গিদ্ ও বারেসের জন্য নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই দুইটি লেখকের রচনা একটু ফেনিল ও দুর্ব্বল, কিন্তু তবু তাঁহারা প্রতিভাবান্। বারেস গোড়াতে রোমাণ্টিক এবং দার্শনিক-বিপ্লবী ছিলেন, কিন্তু পরে রাষ্ট্রনীতি ও সাহিত্যে আস্তে আস্তে জাতীয়তা, নজির ও সংস্কারের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। একটি সম্রান্ত প্রটেষ্টাণ্ট অভিজাত পরিবারে গিদের জন্ম। প্রটেষ্টাণ্ট পরিবারের সুকঠিন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নিচ্ছিদ্র ধর্ম্মব্যবস্থার মধ্যে তিনি বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে নীতিবিরুদ্ধ গীতিকাব্যের প্রকাশ ও পুরাগত বিধিনিষেধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় অত্যন্ত নিন্দিত হইয়াছিলেন। 'পালিউদ' 'টেরেষ্ট্রীয়াল নারিশমেণ্টস্-এ' গিদ প্রচার করিয়াছেন যে, মানুষের অন্তঃকরণের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন অবসর থাকিবে—যত কিছু নূতন আবিষ্কার যত কিছু বিচিত্র অনুভূতি, সমস্ত সৌন্দর্য্য প্রবাহকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া উপচিত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

কিন্তু বারেসের মত গিদের এই অন্তরের স্বাধীনতা যুগধর্ম্মের মিথ্যা ধারা বা মেকী সম্মানের কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য নয়। মুক্ত হইয়া পুরাকালের, পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষ এবং ইহজগতের পূর্ব্বতন অভিজ্ঞতা হইতে শক্তি সঞ্চয় করিবার রহস্য অনুসন্ধান করাও গিদের উদ্দেশ্য নয়। যাহা কিছু ভালো লাগে তাহা হইতে এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও পূর্ব্ববর্ত্তী তাঁহার অনুরূপ কবিদের নিকট হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে মানুষের জগৎ হইতে দূরে অতিদূরে উঠিয়া নীচে মানুষের উপর আত্মোৎসর্গের বীজ ছড়াইয়া দেওয়া—রোঁলার স্বাধীনতা-সাধনার এই পথেও গিদ চলিতে পারেন নাই।

রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতেছে। ধরণীর প্রলোভনের এই অবিরাম প্রবাহের কাছে নিজের ব্যক্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়াই এই অবসর কামনার একমাত্র লক্ষ্য। আঁদ্রে গিদের দৃষ্টি ও বাণীর এই অর্থ।

সুতরাং ইহা আশ্চর্য্য নয় যে, গিদ ও বারেসের অনুরাগী শিষ্যের সংখ্যা খুব বেশি। তাঁহাদের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিলাস বহু মাঝারী লোকের দৃষ্টি ঝল্‌সাইয়া দিয়াছে। যাহাদের চরিত্রে দুর্ব্বলতা আছে তাহারা ইঁহাদের মানুষী স্খলন-পতনের প্রতি সহনশীলতায় আকৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহাদের কলাকুশলতা সবল চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন লোকদিগকে টানিতে পারে নাই, কিন্তু যাহারা ক্ষীণবল তাহাদিগকে আনন্দ দিয়াছে। সমাজস্থিতির যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার ব্যাঘাত হয় না, সে অবস্থাকে যদি কোনো রাষ্ট্রীক আন্দোলন ভাঙ্গিয়া দিতে চায়, তবে সে সব আন্দোলনকে ইঁহারা অবজ্ঞা করেন,—সমাজের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যাহারা খুশী থাকিতে চায় তাহারা ইঁহাদের অবজ্ঞাকে সম্মান করে। এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা-কামনার মধ্যে তাঁহারা এমন একটি স্থান অধিকার করিয়া আছেন যে একটি কোমল আবেশময় প্রলোভন তাঁহাদের প্রতি বহু লোককে সহজে আকৃষ্ট করে।

কিন্তু ইঁহাদের চাইতে একদিকে ফ্রাঁস, রেণার্দ, মরাস এবং অপরদিকে পেগুই, স্যুয়ারে ও রোঁলার ব্যক্তিত্ব অনেক বৃহৎ ও গভীর। বারেসের ও গিদের সৃষ্টিতে সত্য ও সৌন্দর্য্য যথেষ্ট থাকিলেও সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্ব্বোক্তদের প্রভাব অত্যন্ত নিবিড় হইয়া থাকিবে।

ইউরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্বেকার গদ্য-সাহিত্য আলোচনা করিতে যাইয়া আরও দুইটি লেখকের নাম উল্লেখ না করিলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। আমরা পল্ আদাম্ ও রস্‌নীর কথা বলিতেছি। আদাম্ অল্প কিছু দিন হইল স্বর্গীয় হইয়াছেন। তিনি বহু যত্ন করিয়া অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "দি ফোর্স"এ মহাকাব্যের ওজস্বিতা আছে। ফরাসী সাহিত্যে এই গ্রন্থখানি স্থায়ী স্থান লাভ করিবার

উপযুক্ত। রস্নী আদামের সঙ্গে তুলনীয় নন। কিন্তু তিনিও তাঁহার মতই শক্তিমান লেখক। তাঁহার রচনাও অল্প নয়। তিনি ওয়েলসের পূর্ব্বে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কাহিনী গল্পাকারে অনেক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার "ওয়ার অফ্ ফায়ার" ও "ফেলিন্ সোভাজ্" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি অনেক গল্প-উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

* * * *

তার পরই ইউরোপে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। ১৯১৪ সালের ২রা আগষ্ট হইতে সমস্ত প্রবীণ লেখকগণ মসী ছাড়িয়া অসি ধরিতে বাধ্য হইলেন। চার বছরের মধ্যে তাঁহারা ধরণীর বক্ষ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেন। ১৯১৮ সনের ফরাসী লেখকদিগের মধ্যে ২৫ হইতে ৩০ বৎসর যাঁহাদের বয়স তাঁহাদের জন কয়েক ছাড়া আর কেহ জীবিত রহিলন না। মহাযুদ্ধের এই হত্যাকাণ্ড পুরাতন ও নবীনের সঙ্গে সংযোগ সূত্র ছিন্ন করিয়া দিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সোস্যালিজম্ ও বিশ্বমানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ত্রিংশবর্ষীয় কবি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা সঙ্গে করিয়া আনিলেন তাঁহাদের বিশিষ্ট শক্তি ও সুস্পষ্ট সাধনা। যুদ্ধে যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন ও যে শিক্ষা পাইলেন তাহার ফলে তাঁহাদের শক্তি সাধনার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রের মহাশ্মশান হইতে যাঁহারা আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন তাঁহারা আর পূর্ব্বের আদর্শ ফিরিয়া পাইলেন না। তাঁহাদের চিন্তা ও সাধনায়, বচনে ও রচনায় মহাসমরের বিভীষিকা ছায়ার মত অনুসরণ করিতে লাগিল। ইউরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার সমতা নষ্ট হইয়া যে আলোড়ন ও অশান্তির সৃষ্টি হইল তাহার প্রতি তাঁহারা আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, এই যুগের লেখকগণ বর্ত্তমান জগতের অসঙ্গতির চিত্র অঙ্কনে ও তাহার সমস্যা অনুসন্ধানের কাজে লাগিয়া পড়িয়াছেন। নানা জন নানা পথে এই সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত করিতেছেন। বার্বুস্ বিপ্লব-প্রচারের মধ্যে, দুহামেল্ ভ্রাতৃত্বের সহৃদয়তার মধ্যে, ভিল্‌দ্রাক্ সবল ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক স্ফুরণের মধ্যে এই সমাধানের আভাষ পাইতেছেন। হেবর্থ, দুর্তাঁ, ফর্, মার্টিন দু গার্দ, হাম্প—ইঁহারা ফরাসী সমাজের নীতি-ধর্ম্মের একটা হিসাব-নিকাশ করিতে বসিয়াছেন। বার্বুসের "ফায়ার", দুহামেলের "লাইফ্ অফ্ মারটারস্" ও "পজেশন্ অফ্ দি ওয়ার্লড্", ভিলদ্রাকের "ডিস্‌কাভারিজ", হেবর্থের "কোচিন চায়না", মার্ত্তিন্ দু গার্দের "দি থিবল্ট", হাম্পের "দি সয়োজ্ অফ্ ম্যান্‌কাইণ্ড" এবং ফরের "হিষ্ট্রী অফ্ আর্ট"—এই সম্প্রদায়ের লেখকদিগের উল্লেখযোগ্য রচনা।

এক যুগের সঙ্গে পরবর্ত্তী যুগের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া সভ্যতার একটানা প্রবাহে আঘাত পড়ে। বর্ত্তমান ফরাসী-সাহিত্য পড়িয়া মনে হয়, ইহা যেন সমগ্র কবিতার একটি খণ্ড বা ভগ্নাংশ মাত্র। কোথাও যেন পূর্ব্বাপর্য্য বা পারম্পর্য্য নাই। লেখকরা যেন একটা মহাশূন্যের মধ্যে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন। যাঁহারা চল্লিশের ঘরে পা দিয়াছেন তাঁহারা পরবর্ত্তীযুগের কাছে পূর্ব্ববর্ত্তীদের সাধনা নিবেদন করিতে পারিতেছেন না—যাঁহারা ত্রিশের কাছা কাছি আসিয়াছেন তাঁহারা যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত আঘাতে বিমূঢ় হইয়া গেলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠও তাঁহাদের সমাপ্ত হইল না। না হইল তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতি সাধন, না হইল ধ্যান-ধারণা বা হৃদয়-বৃত্তি স্ফুরণের অবসর লাভ। এই সব তরুণ বীর যুদ্ধের সাজে নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া, নারী ও অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে অস্বাভাবিক জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে জীবন তরণী বাহিয়া চলিলেন—তাহাতে শোক-তাপ-দুঃখ-দৈন্য বিরহ-বেদনার আঘাতকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের চিত্ত কঠিন কঠোর হইয়া উঠিল,—যাহা কিছু মানব-হৃদয়কে স্পর্শ করিতে চায় তাঁহারা তাহা বিষবৎ পদাঘাত করিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া দিলেন!

অকালেই তাঁহারা পরিপক্কতা লাভ করিলেন, সংযত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পরিণতি এবং সাধনার ছাপ রহিল না। তাঁহাদের শাসন করিবার ইচ্ছা আছে

কিন্তু সামর্থ্য নাই, তাঁহারা সমস্তার সমাধান করিতে চান, কিন্তু তাহাতে সামঞ্জস্য নাই, তাঁহাদের বর্ত্তমান আছে কিন্তু ভবিষ্যৎ নাই।

সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ব্বরতা, হত্যাব্যবসার নৃশংসতা, উন্মত্ত স্বদেশানুরাগ, আত্মোৎসর্গের অর্থহীন প্রলাপ ও উদ্ধত শাসনদণ্ড হাতে লইয়া যখন তাঁহারা সাহিত্য-রচনায় মন দিলেন তখন সে-সাহিত্য উজ্জ্বল, সবল, উদ্ধত এবং বর্ব্বরোচিত হইয়া উঠিল। সামরিক শিক্ষার মধ্যে যে বিধি-নিষেধের আস্বাদন ইঁহারা পাইয়া আসিয়াছেন সমাজে তাহার সাক্ষাৎ না পাইয়া সমস্তই তাঁহাদের কাছে খেলার সামগ্রী হইয়া উঠিল। ফলে তাঁহারা জীবনের লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিলেন। সাহিত্যের এই 'ফ্যাসিজম্' সর্ব্বত্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের এই সাহিত্যসৃষ্টিতে মেধা বা প্রতিভা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য-সঙ্গতির কোনো চিহ্ন নাই। এই সাহিত্যের মর্ম্মানুসন্ধান করিলে ইহাও বাহির হইয়া পড়িবে যে, এই লেখকদিগের মূলসুর হতাশারই সুর। যত দিন যাইতেছে তাঁহারা যেন অনুভব করিতেছেন যে, এই সমাজে তাঁহাদের পরিণতির সম্ভাবনা নাই, কেন না ইহাতে স্বাভাবিক বিকাশ নাই,—সমস্ত ব্যবস্থা ও বিধান কবে যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সব ধ্বসিয়া পড়িবে।

কিন্তু তারপর আরো একটি তরুণের দল গড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধাবসানের পর হইতে তাঁহাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে জন্মলাভ হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন মানবতা, নিঃস্বার্থ অধ্যবসায়, চিন্তা, কর্ম্ম, আশা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের বয়স সাধারণতঃ পঁচিশ। তাঁহাদের মুখপত্র "দি স্পিরিট"। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল, "ফিলোসফি"। তাঁহারা চিন্তাশীলতার নবজন্ম প্রচার করিয়াছেন। খেলা করিবার অবসর তাঁহাদের নাই, অধ্যাত্মতত্ত্বের দিকে তাঁহারা মুখ ফিরাইয়াছেন। এখন বাজে কথা, তুচ্ছ আলোচনা নয়, কিন্তু নিবিড় একাগ্র সাধনার সময়। আরলাঁদ, মার্সিনঁ, মারসেল্, বারুচির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব। এই নূতন অভ্যুদয়ে তিরিশের দলের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগিয়াছে। তাঁহাদের খ্যাতিতে ভাঁটা পড়িয়াছে একথা যেন তাঁহারা অনুভব করিতে পারিতেছেন, তাহাতে একটু শঙ্কিতও হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের রচনার নূতন তাৎপর্য্য প্রচারের জন্য যেন একটু ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার ফল হয়তো শুভ হইবে।.........

গত ছয় বছরের সাহিত্য হতাশা, আত্মম্ভরিতা, গর্ব্ব ও নানা প্রকারের চাঞ্চল্যে ভরিয়া উঠিয়াছে ;—ফ্রান্স ও জার্ম্মেনীর সাহিত্য ও চিত্রাঙ্কণে একটা অতিমাত্রায় পুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। সমাজ যে পর্য্যন্ত তাহার শক্তি ও চিন্তাপ্রবাহের শৃঙ্খলা ফিরিয়া না পাইবে সে পর্য্যন্ত ইহার সামঞ্জস্য হইবে না।

ফরাসী সাহিত্যে যে দুইটি ধারার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এই তরুণ শিল্পীদিগের মধ্যেও সেই দুইটি ধারা দেখিতে পাই। যাঁহারা রোমাণ্টিক, তাঁহারা নিজেদের নূতন নামকরণ করিয়াছেন, 'সুপার-রিয়ালিষ্ট'। বিপ্লব-বিদ্রোহের দিকে তাঁহাদের ঝোঁক, রাষ্ট্রনীতির প্রতি তাঁহাদের অশ্রদ্ধা, 'ডাইরেক্ট এ্যাক্‌শনে'র তাঁহারা পক্ষপাতী, কিন্তু শ্রমিক ও জনপ্রিয় লোকনায়কদিগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নন বলিয়া তাঁহারা ব্যর্থ হন। যুদ্ধের পর হইতে য়ুরোপের অন্তর এখনও শান্ত হইতে পারে নাই। এই সর্ব্বব্যাপী অশান্তির যুগেও তাঁহারা সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ভবিষ্যতে তাঁহাদের স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা এখনও অনিশ্চিত।

তরুণ লেখক হেনরী দ্য মন্থারলাণ্ট্ খুব নাম করিয়াছেন। তাঁহার রচনা নিখুঁত নয়, কিন্তু তাহাতে প্রতিভা ও নূতনত্বের চিহ্ন আছে। ক্যাথলিক পরিবারে তাঁহার জন্ম; সেখানকার সঙ্কীর্ণ সংস্কার তাঁহাকে পীড়িত করে বলিয়া তাঁহার বিদ্রোহী আত্মা অন্য দিকে বিকাশিত হইতে চাহিতেছে। নূতন যুগের পথযাত্রীদের তিনি অগ্রদূত, তাঁহাদের কাছে তিনি আধ্যাত্মিক মুসোলিনী।

ম্যাক্স জ্যাকব, ককৃতো প্রভৃতি লেখকগণ অন্য একটি দলের অগ্রণী। তাঁহারা সাহিত্যের বিলাসিতায় পরিপূর্ণ।

তাঁহাদের রুচি মার্জ্জিত, তাঁহারা নূতন নূতন রীতিনীতির প্রবর্ত্তক, আর্টের নূতন নূতন ধারার পথ-প্রদর্শক। খাঁটি সাহিত্য-চর্চ্চাই ইঁহাদের কাজ। যাঁহাদের চিন্তা বা নীতি-উপদেশ দ্বারা সমাজের পরিবর্ত্তন সাধিত হয় ইঁহারা সে দলের নন। যে রুচি বা প্রকাশ-ভঙ্গী পুরাতন হইয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে নূতনত্বের পথে লইয়া যাইতে ইঁহারা সাহায্য করিতে পারেন মাত্র। ইঁহাদের লিখিত "পোয়েটিক আর্ট" ও "প্রোফেশনাল্ সিক্রেট" পড়িলে ইঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

গল্প-লেখকদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যে কথা বলিয়াছি, কাব্য, নাটক, সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাহাই সত্য। কিন্তু যেদিকেই দেখি,—গল্পে, পদ্যে, কাব্যে, নাটকে সর্ব্বত্রই আপনাকে আপনার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য একটা আকুল আবেগ জাগিয়া উঠিয়াছে—'জীবনের অর্থ কি?' এই বহু পুরাতন প্রশ্নটিরই আবার নূতন করিয়া উত্তর দিবার জন্য একটা করুণ আকাঙ্ক্ষা, বেদনাপূর্ণ প্রয়াস চলিয়াছে।

—মডার্ণ রিভিউ, সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

অনুবাদক—শ্রী সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

গান

নজরুল ইস্‌লাম

কোরাস্ ঃ—

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

কোরাস্ ঃ—দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু ইত্যাদি

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার॥

কোরাস্ ঃ—দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু ইত্যাদি

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ!
"হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম্?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

কোরাস্ ঃ—দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু ইত্যাদি

গিরি-শঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গরজায় গুরু বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি নিয়াছ যে মহাভার!

কোরাস্ ঃ—দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু ইত্যাদি

কাণ্ডারী, তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যথা ক্লাইবের খঞ্জর।
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙ্গিয়া পুনর্ব্বার।

কোরাস্ ঃ—দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু ইত্যাদি

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুশিয়ার!

স্বরলিপি

নজরুল ইস্‌লাম

কোরাস্ ঃ—I I { র্সা -া ধা | ধা পা পা | গমা মা মা | মা মা মা I
দু • র্গ ম গি রি কা • ন্তা র ম রু
র্গা র্গা র্গা | র্গা র্গা র্গা | র্মা -া র্রা | র্সা ধা না I
দু • স্ত র পা রা বা • র হে • •
র্সা র্গা র্রা | র্রা র্রা র্রা | র্সা না র্সা | ধা ধা না I
ল • ঙ্ঘি তে হ বে রা • ত্রি নি শী থে
র্সা র্গা র্রা | র্রা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | -া -া -া } II
যা • ত্রী রা হু শি য়া • র • • •

I I { সা মা মা | মা মা গা | মা পা পা | পা পা ধপমগা I
দু লি তে ছে ত রী ফু লি তে ছে জ • • ল—১
তি মি র রা • ত্রি মা • তৃ ম • • ন্ত্রী—২
অ স হা য় জা তি ম রি ছে ডু বি য়া •—৩
গি রি শ ঙ্ক ট ভী রু যা • ত্রী রা •—৪
কা ন্ ডা রী ত ব স ম্ মু খে ও ই •—৫
ফাঁ সি র ম ন্ চে গে য়ে গে ল যা রা •—৬

মা ধা ধা | ধা ধা ধা | ধা -া ণা | ধণা ধপা মগা I
ভু লি তে ছে মা ঝি প • থ হে • •—১
সা • ত্রী রা সা ব ধা • ন হে • •—২
জা নে না স • স্ত র • ণ হে • •—৩
গ র জা য় গু রু বা • জ হে • •—৪
প লা শী র প্রা ণ্ ত • র হে • •—৫
জী ব নে র জ য় গা • ন হে • •—৬

[র্সা -া ধা ধা ধা পা পা]
I মা ধা ধা | ধা ধা ধা | পা পা পা | মা মা মা I
ছিঁ ড়ি য়া ছে পা ল কে ধ রি বে হা ল—১
যু গ যু গা ন্ত স ন্ চি ত ব্য থা—২
কা ন্ ডা রি আ জ দে খি ব তো মা র—৩
প শ্ চা ত প থ যা • ত্রী র ম নে—৪
বা ঙা লী র খু নে লা ল হ ল য থা—৫
আ সি অ ল • ক্ষ্যে দাঁ ড়া য়ে ছে তা রা—৬

I মা ধা পাধ | মা গা মা | রাগ -াগ -াগ | না সা -া } I
আ ছে কা র হি ম্ ম • ৎ হে • •—১
ঘো ষি য়া ছে অ ভি যা • ন হে • •—২
মা • তৃ মু • ক্তি প • ণ হে • •—৩
স ন্ দে হ জা গে আ • জ হে • •—৪
ক্লা ই বে র থ ন্ জ • র হে • •—৫
দি বে কো ন্ ব লি দা • ন হে • •—৬

I { পা ধা পা | পা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | -া -া পা I
কে আ ছ জো য়া ন হ ও আ গু য়া ন—১
ফে না ই য়া উ ঠে ব ন্ চি ত বু কে—২
হি ন্ দু না ও রা মু স্ লি ম্ ও ই—৩
কা ন্ ডা রী তু মি ভু লি বে কি প থ—৪
ও ই গ ঙ্ গা য় ডু বি য়া ছে হা য়—৫
আ জি প রী • ক্ষা জা তি র অ থ বা—৬

পর্সা -া -া | র্সা -া -া | র্সা -া -া | র্সা ধা না } I

হাঁ কি ছে ভ বি • য্য • ৎ হে • •——১

পু ন্ জি ত অ ভি মা ০ ন হে • •——২

জি • জ্ঞা সে কো ন্ জ • ন হে • •——৩

ত্য জি বে কি প থ মা ০ ঝ হে ০ ০——৪

ভা র তে র দি বা ক ০ র হে ০ •——৫

জা তে র ক রি বে ত্রা ০ ণ হে • •——৬

I { র্সা র্গা র্গা | র্গা র্গা র্গা | র্মা র্মা র্রা | র্রার্গ র্সা র্সা I

এ তু ফা ন ভা রি দি তে হ বে পা ড়ি

ই হা দে র প থে নি তে হ বে সা থে

কা ন্ ডা রী ব ল ডু বি ছে মা নু ষ

ক রে হা না হা নি ত বু চ ল টা নি

উ দি বে সে র বি আ মা দে রি খু নে

ছু লি তে ছে ত রী ফু লি তে ছে জ ল

I র্সা র্গা র্গা | র্রা র্রা র্রা | র্সা নর্সা ধা | ধা না র্সা } II

নি তে হ বে ত রী পা • র হে • ০

দি তে হ বে অ ধি কা ০ র হে • •

স ন্ তা ন মো র মা • র. হে ০ ০

নি য়া ছ যে ম হা ভা ০ র হে ০ ০

য়া ভি য়া পু ন র বা ০ র হে ০ •

কা ন্ ডা রী হু শি য়া • র হে • •

———

পাঁক

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

আর যাই হোক গগন খাটতে পারে বটে!

দিনরাতের মধ্যে তার হাতের কামাই নেই—একটা না একটা কাজে লেগে আছেই। বসে থাকা তার ধাতে সয় না বোধ হয়। এই কাপড় কাচ্‌ছে, তার পরেই ঘর ধুচ্ছে, তারপরই হয়ত দেখা যায় গগন একরাশ বাসন নিয়ে বসেছে মাজতে।

পদ্ম ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ে মাতা অবধি আর ত সংসারের দিকে ঘেঁসে না। একা গগনই সব করে। তার ব্যাজার নেই—

মুখে তার খিটিমিটি লেগেই আছে বটে হরদম!

তা হোক ; মুখের বিরাম যেমন নেই হাতের তেমনি—ফুরসৎ আছে কি তার!

আর কেই বা কান দেয় তার গজগজানিতে? গগনকে সবাই চেনে।

গগন তবু কাপড় ইস্ত্রি করতে করতে নিজে নিজেই গজগজ করে—

"ধম্মোশালা খুলেছি কিনা আমি, তিনমাস ভাড়া দেবার নাম নেই! আর একটি হপ্তা দেখব তারপর ঘাড় ধরে বার করে দেব ......ভাড়াটের অভাব নাকি সহরে? কবে উনি ভাড়া দেবেন সেই আশায় বসে থাকতে হবে...আজ নুটিশ দিলে কাল অমন দশ ব্যাটা এসে হুমড়ে পড়বে···তবে কিসের খাতির শুনি···কোন্‌ পুরুষের কে ওবেটা। ছাতুখোর যে ওকে বসিয়ে বসিয়ে ভাড়া গুণগার দিতে হবে......"

বুড়ো হিন্দুস্থানী ঘরের চৌকাঠে লাঠি হাতে করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে। বাংলা সে বোঝে কি?

পদ্ম ঠাকুরঘরে বসে পুজো করে।

গগন বকে যায়..."পুজো হচ্ছে, পুজো! আমাদের পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে আর ওর জন্যে সগ্‌গ থেকে রথ আসবে নেবে! হয়েছে আর কি!..."

থাক্‌ থাক্‌ কাপড় ইস্ত্রি হয়ে যায় এরমধ্যে! কাজ সে করতে জানে বটে!

বুড়ো হিন্দুস্থানী উঠে ঘরে যাবার উদ্যোগ করে বোধ হয়!

গগন হেঁকে বলে, "ওহে লাটের নানা! একটু শোন দেখি!"

বুড়ো ফিরে তাকায় মাত্র; একপাও এগোয় না।

"ভাড়াটা দেবে কবে?"

বুড়ো মাথা নেড়ে বিজ্‌-বিজ্‌ করে কি বলে—দূর থেকে বোঝা যায় না!

ইস্ত্রির লোহাটা উনুনের ওপর রেখে গগন বলে, "ওসব ইজ বিজ বিজ নয়, সোজা বাংলায় ভাড়াটা দু'দিনের মধ্যে দিয়ে ফেলতে হবে...বুঝলে?"

বুড়ো একদম চুপচাপ ঘরে ঢোকবার উপক্রম করে।

গগন আবার ডেকে বলে,—"তিনমাসের ভাড়া পুরো চাই!"

বুড়ো মুখ পর্য্যন্ত ফেরায় না—সটান গিয়ে ঘরে ঢোকে।

বুড়োর দ্যামাক্‌ একটু বেয়াড়া রকমের নয়?

গগনের সহ্য হয় না। রক থেকে নেমে বুড়োর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, "ভারি নবাবী চাল যে দেখি, ভাড়ার কথা......"

বুড়ো সশব্দে গগনের মুখের ওপর দরজাটা ভেজিয়ে তাড়া লাগিয়ে দেয়।

হবার কথা বটে!

বুড়োর স্পর্দ্ধায়—গগন খানিক স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে

থাকে! তারপর রাগে দরজায় সজোরে লাথি মেরে বলে, "খোল কেওয়াড়ি!"

দরজা ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে। ভেতরে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

গগন লাথি মারবার জন্যে আবার পা ওঠায় কিন্তু কি ভেবে আবার থামে।

রাগের ঝোঁকে কি আর একটা দরজা ভাঙ্গা যায়! আর এই গায়ের রক্ত জল করে তৈরী করা—এই দরজা!

কিন্তু সে গগন! তারই এলাকার মধ্যে তার ভাড়াটে ভাড়া না দিয়ে তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে তার মান থাকে কোথায়? একে ত সেদিন পটলির কাছে যতদূর হবার হয়ে গেছে! পটলির কাছে হার মেনে দাওয়া থেকে নেমে যাওয়াটা কার আর দেখতে বাকী ছিল? সুতরাং একটা কিছু করতেই হয়!

গগন দরজার বাইরের শিকলিটা তুলে দেয়, তারপর চোখ রাঙিয়ে চারিদিকে একবার ঘুরে তাকিয়ে বলে—, "এ শিকলি যে খুলবে আজ তারি একদিন কি আমারি একদিন।"

ঘরে ঘরে সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। এত কাণ্ড মুখ ফিরিয়েও কেউ দেখেনি বোধ হয়।

গগন ফিরে যেতে যেতে বলে,—"তেল এবার বেরুক! মরুক বুড়ো ইঁদুরের মত পচে।"

সত্যি রাগের জন্যে ত আর একটা দরজা ভাঙ্গ যায় না!

কিন্তু শিকলি তুলে দেওয়াটাও কি একটু বাড়াবাড়ি হল না?

হোক্! অত বিচার করে কাজ করতে গগন পারে না। দিক্ ধরে গেছে তার সংসারে। কেন, সবাই কি মরেছে, না সংসারের দায় তার একার যে সে একলা সব দিক সামলাবে—রাতদিন!

গজগজ করতে করতে গগন ইস্ত্রি করা সেরে কোদাল চুবড়ি নিয়ে বেরোয়। ঘরের দেওয়ালে লেপবার মাটি আনতে বোধ হয়।

পদ্ম ঠায় বসে পূজো করে। এ জগতেই সে নেই বোধ হয়! এত কাণ্ডের ভেতর একবার চোখ ফিরিয়ে চায় না পর্য্যন্ত।

পূজোয় সে কি এতই মত্ত! না আর-কিছু আছে!

পূজো সে করে বটে আজকাল! সত্যিকারের পূজো! মায় তামার কোশা-কুশী পর্য্যন্ত কিনতে তার বাকী নেই। কণে-বৌ পর্য্যন্ত স্বীকার করে গেছে যে এ-পূজো পূজোর মত বটে,—ভড়ং নয়।

হয়ত পদ্ম কণে-বৌদের জন্যেই পূজো করে, হয়ত পূজোর পেছনে আরো গভীর কিছু আছে, দুর্ব্বোধ, রহস্যময়, যেমন মানুষের সব কিছু···

হয়ত দুইই।

আজ কিন্তু পদ্মর পূজো সারা আর হয় না। বুড়ো ভেতর থেকে বন্ধ দরজায় ধাক্কার পর ধাক্কা দেয়। ভাড়াটেরা ঘরে ঘরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে—। তবু পদ্ম ওঠেনা।

চারীর ক'দিন থেকে বাবুর বাড়ীর কাজ গেছে। ঘরেই বসে বসে দিন কাটায়! চারিদিকে ভাল করে গগন আছে কিনা দেখে বলে,—

"এ আবার কি রকম কথা বাপু! ভাড়া দায়নি বলে দরজায় শিকলি তুলে দেবে! জুলুম নাকি!"

পটলির ঘর থেকে গুলে, কণে, ভোমরার মা চোখ মুখ ও হাতের সাহায্যে নীরবে জানায়—এ-কথায় তার সম্পূর্ণ সায় আছে। মুখে সে কিন্তু কিছু বলে না। দরকার কি মুখের কথার! সব সময়ে তেমন নিরাপদও নয়।

মাস-খানেক হল সে তিনটে বকাটে ছেলে নিয়ে পটলির জায়গায় ভাড়া এসেছে।

"আহা বুড়ো মানুষ গা! কি শাস্তি বলত!"—চারীর সহানুভূতি ক্রমশ বাড়ে—"কে এই নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করতে যাবে বাবা নইলে শিকলি আমিই খুলে দিতাম।"

গুলের মার ছোট ছেলেটা ভোঁতা একটা ছুরি দিয়ে বসে বসে বাঁকারি চাঁচ্‌তে চাঁচ্‌তে বলে,—"দেব খুলে?"

গুলের মার চোখ কপালে ওঠে।

শরী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "না বাবা! ও কথাটি মুখে

এন না! খুললে আজ আর কারও নিস্তার থাকবে না। রক্তারক্তি হয়ে যাবে! তাহলে আর আমি দিতাম না!"

দশ বছরের ভোমরা অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভরে বাঁকারি চাঁচতে চাঁচতে ভারীক্কি চালে অবজ্ঞার সুরে বলে, "হোক অমন কত রক্তারক্তি দেখেছি! নোনাতোলার ছেলেকে আর রক্তারক্তি দেখাতে হবে না, নাম শুনলে সব এমনি করে কাঁপতে থাকবে।"

বাঁকারি কাটা থামিয়ে হাত পা নেড়ে ভোমরা কাঁপুনিটা ভাল করে দেখিয়ে দেয়।

তার মা এবার কথা না কয়ে পারে না। প্রশংসমান দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে বলে, "তা সত্যি বাপু! ও পাড়ায় থাকতে কটা ছোঁড়াতে যেন দিগ্বিজয় করে বেড়াত!" তারপর হঠাৎ উপস্থিত ব্যাপারটা মনে পড়ে যায়। গুলের মা সাম্‌লে নিয়ে বলে, "কিন্তু খবরদার বাবা এ বেপাড়ায় গোঁয়ার্ত্তুমির নামটি কোরোনা, এখানে কে তোমার আছে ধন্!"

কিন্তু ভোমরার এখন মেজাজ চড়ে গেছে! বাঁকারি দিয়ে সপ্ সপ্ করে মাটিতে দু ঘা বসিয়ে দেয়—কিসের বেপাড়া! এই এমন করে একটা শিষ দিয়ে ডাক দিলে তাদের আখড়ার ছেলে এসে পাড়াকে পাড়া লুটে নিয়ে চলে যাবে—চোখের পলক পড়তে দেবে না! তাদের আখড়ার শিষ সে জানে না?

বিচিত্র ভাবে দু'হাতের আঙুল গুলো জুড়ে মুখের ভেতর দিয়ে তাদের আখড়ার সাঙ্কেতিক শিষটা পর্য্যন্ত ভোমরা দেখিয়ে দেয়!

গুলের মা স্মিতমুখে ছেলের মুখ থেকে চারীর দিকে চায়।

কিন্তু মাথায় খাটো ওই একরত্তি ছেলের এমন সাউখুড়ি চারীর বোধহয় পছন্দ হয় না; সে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

গুলের মা ছেলের বাহাদুরীতে প্রফুল্ল হয়ে তবু ডেকে বলে, "শুনলে ত দিদি ওই করছে দিনরাত! এত শিখিস্ কোথা বলত?"

ঘাড় কামানো সামনে ঝুঁটিওলা মাথাটা সামনে পেছনে নেড়ে মুখের অপরূপ ভঙ্গি করে গম্ভীর হয়ে ভোমরা বলে, "সে সব তোমরা কি বুঝবে! কোলা ব্যাঙের কলিজা খেতে হবে আগে! পারবে?"

"দূর মুখপোড়া, তোর শিষ দেওয়া বুঝে আমার কাজ নেই।" হাসতে হাসতে গুলের মা আরো বলে, "শুনলে দিদি, ছেলের কথা, আমরা বুড়ো মাগী আমাদের শুদ্ধু খ করে দেয়!"

কিন্তু চারীর আর সহ্য হয় না; ভুরু কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, "এত ত ভাল নয় দিদি, তোমার ছেলে বড় বেশী ফাজিল! কচি মুখে কি পাকা কথা মানায়!"

গুলের মার মুখের সব হাসি মিলিয়ে যায়, মুখ ভার করে বলে, "ফাজিল আবার কোথা দেখলে তুমি দিদি! ছেলে মানুষ অমন কত বলে!"

"না বাপু! ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মত থাকবে, এ ছেলের মুখে যেন খই ফুটছে, পুঁতলে সগু সগু গাছ হয়! ছেলেমানুষ কি আর আমরা দেখিনি!"

"কোথা থেকে আর দেখলে বাছা? পেটে ত আর একটা ধরনি......"

বুড়োর কথা আর কারু মনে নেই—

বুড়ো তখনও ঘরের ভেতর থেকে ধাকা দিচ্ছে!

পদ্ম পুজোর ঘর থেকে তখনও ওঠেনি।

... ...

কিন্তু ব্যাপারটা তেমন বেশী দূর পর্য্যন্ত গড়াল কই?

সন্ধ্যার পর কাপড় জোগান দিয়ে ফিরে এসে গগন শুধু জিজ্ঞাসা করলে গম্ভীর মুখে, "দরজা খুললে কে?"

পদ্ম ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে বল্লে, "আমি।"

"ওঃ"—

গগন সটান ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। একটা জোরে হাঁকুনি পর্য্যন্ত নয়!

কনে-বৌয়ের অগাধ ফুরসৎ। চারীর ঘরে বুঝি বেড়াতে এসেছিল। আবার বাড়ি চল্ল।

"এসেই চল্লে গা! একটু বসলেও না? এখানে কি ছাই কথা কইবার যুগ্যি একটা মানুষ আছে! তুমি এলে তবু দু'দণ্ড কথা কয়ে বাঁচি!" চারী একবার পাশের ঘরের দিকে আড় চোখে তাকিয়েও নিল।

"না যাই বোন, বসবার কি যো আছে! নাৎনিটাকে একা ফেলে এসেছি।"

কনে-বৌ বেড়াতেই হয়ত এসেছিল। অবিশ্বাসের কি আছে! ক্রমশ

বিচিত্রা

বাজনা বন্ধের বেয়াকুবী আজ বাঙ্গলায় যে বর্ব্বরতাকে ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহা মিঃ গজনভি সাহেবকেও হয়ত লজ্জা দিবে।

মসজিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধের জেদ্ লইয়া যখন তাঁহারা প্রচারে নামেন, বাঙ্গলার অজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুর বাজনা বন্ধের উন্মাদনা যখন সৃষ্টি করিতে থাকেন, তখনই আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, ইহার ফল বিষময় হইবে। হইয়াছেও তাই। আজ অজ্ঞ মুসলমানের উৎসাহ এতটাই মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে যে, বাজনা বন্ধের প্রবর্ত্তক হিসাবে মিঃ গজনভিরও লজ্জিত হইবার কথা, অবশ্য যদি লজ্জিত হইবার মত কোন বস্তু এখনো তাঁহার অবশিষ্ট থাকে।

* * *

কলিকাতার ছকু খানসামার লেনের এক হিন্দুর বাড়ীতে ভক্ত নাগ মহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে কীর্ত্তন হইতেছিল, কিন্তু হইলে কি হয়, ঐ পাড়ার মুসলমানদের কর্ণে সেই কীর্ত্তনধ্বনি যেই পৌছাইল অমনি তাঁহারা কীর্ত্তন বন্ধের দাবী করিয়া বসিলেন। মুসলমানদের নামাজের সময় উপস্থিত হইলে তখন হইতে আর কোন হিন্দু তাহার বাড়ীতে পূজা অর্চনা কীর্ত্তন করিতে পারিবে না, করিতে চাহিলে মুসলমানরা আসিয়া বন্ধ করিয়া দিবে। মিঃ গজনভি যখন বাজনা বন্ধের দাবী করেন তখন কি তিনি এই দাবীও করিয়াছিলেন যে, হিন্দু তাহার নিজ বাড়ীতেও কীর্ত্তন দিতে পারিবে না, যদি সেই কীর্ত্তনের শব্দ কেবল ধার্ম্মিক মুসলমানের কর্ণে পৌঁছায়? যদি এ দাবী তাঁহার দাবী না হইয়া থাকে, তবে আজ তিনি বুঝুন কোথাকার জল কোথায় গড়াইয়াছে! মুসলমানদের এই রকম করিয়া হিন্দুর কীর্ত্তন বন্ধের উৎসাহকে বর্ব্বরতা না বলিয়া আর কি বলিব?

* * *

কিন্তু ছকু খানসামা লেনের হিন্দুদের এই সকল অত্যাচারী পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপকারী, সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞানহীন, মুসলমানদের জুলুমপ্রিয়তাকে মানিয়া লইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করায় সঙ্গত হয় নাই।—এই সকল অজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞানহীন লোক যে কেবল হাজি গজনভি শ্রেণীর নেতাদের প্রচারের ফলেই এইরূপ করিতেছে তাহা নহে, হিন্দুর দুর্ব্বলতা ও অতি মাত্রায় শান্তি প্রিয়তার জন্যই।—ওই সকল দুর্ব্বৃত্তরা আস্কারা পাইতেছে। ইহাদের এ সকল কার্য্যের জন্য যদি মিঃ গজনভির প্রচার ফল দায়ী হয়, হিন্দুর দুর্ব্বলতা সেজন্য অল্প দায়ী নহে।

* * *

মুসলমান নেতারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন না। অজ্ঞ সাধারণকে সময় থাকিতে সতর্ক না করিলে, এক দিন এই আগুনের খেলায় যে তাহারাই পুড়িয়া মরিবে, ইহা নিশ্চিত। বাজনা বন্ধের হুজুক আজ কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে! ওতে না আছে ধর্ম্মভাব, না আছে সাধারণ ভদ্রতা! অথচ আশ্চর্য্য এই মুসলমান নেতারা অনেকেই এখনো নীরব। মুসলমান সাধারণকে এখনো তাহারা সাবধান করিয়া দিতেছেন না। কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সাধারণ মুসলমান অজ্ঞ থাকিতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানরাও কি এ বিষয়ে অজ্ঞ? না, সত্যই তাঁহারাও মনে করেন যে, শুধু গায়ের জোরেই মুসলমানরা হিন্দুস্থান হইতে, হিন্দুর কীর্ত্তন ভজন পূজা অর্চ্চনা বন্ধ করিতে পারিবেন। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষিত ব্যক্তিই মুসলমানদের এই মতি গতি দেখিয়া লজ্জিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

* * *

পাবনার অত্যাচার অনাচার শেষ হইতে না হইতেই ঢাকাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। ঢাকার জন্মাষ্টমী-শোভাযাত্রা হালের নহে। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শোভাযাত্রায় ঢাকার বিশিষ্ট মুসলমানরা বরাবর যোগ দিয়া আসিতেছেন। কোন কালে এই শোভাযাত্রার বাজনা বন্ধ হয় নাই। ঐ শোভাযাত্রার বাজনায় এত দিন কোন ধার্ম্মিক মুসলমানেরই ধর্ম্ম নষ্ট হইতে শোনা যায় নাই।

মিঃ গজনভি সাহেবের কানে বাজনা পৌঁছিলে হয়ত তাঁহার গুনাহ হয়, কিন্তু তাঁহার বাপ-দাদা এই জন্মাষ্টমী মিছিল দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। এই বিশিষ্ট মিছিলটিকে নিছক অসম্প্রদায়িক আনন্দের বস্তু বলিয়াই ঐ সকল উদার যথার্থ ধার্ম্মিকরা দেখিতেন, মিছিলের বাজনা শুনিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই। ঢাকার ওই এত দিনের মিছিলটিকে নষ্ট করিবার জন্য একজন মুসলমান প্রধান নাকি পূর্ব্ব হইতেই চেষ্টা চালাইতেছিলেন। মিছিল কোন প্রকারে সৈন্যের সঙ্গীনের আওতায় বাহির হইয়াছিল। কিন্তু মিছিল বাহির হইয়াছে, এই আক্রোশেই ঢাকায় মুসলমান গুণ্ডার দল হিন্দুদের যেখানে সেখানে আক্রমণ করিতে থাকে।—মুসলমানরা ছোরা, লাঠি, ইট, পাটকেল ছুড়িয়া হিন্দুদের হত্যা করিয়াছে, খুন জখম করিয়াছে, বাড়ী লুঠ করিয়াছে, অধিকতর অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া হিন্দুর কাছ হইতে মোটা টাকা আদায় করিয়াছে। মিছিল বয়কটের আয়োজনও মুসলমানরা করিয়াছিল।

* * *

মুসলমানরা দিন-বার সেখানে গুণ্ডা রাজত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। ঢাকার অনেকের বিশ্বাস যে, এই সকল গুণ্ডা বদমায়েসদের পিছনে হিন্দু-বিদ্বেষী বিশিষ্ট মুসলমানও কেহ কেহ আছেন। কথা সত্য কিনা, সরকার অনুসন্ধান করিয়া তাহা সাধারণকে জানাইয়া দিন।

* * *

ঢাকার শোভাযাত্রার উপলক্ষে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে পারে এই আশঙ্কা সত্ত্বেও পুলিশ প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারে নাই। মুসলমানরা যখন বেপরোয়া ভাবে হিন্দুদের উপর জুলুম করিয়া অরাজক রাজ্যের সূচনা করিয়াছিল, তখন বিপন্ন হিন্দুদের রক্ষার্থ সমর্থ হিন্দু ছাত্ররা বাহির হইতে পারে নাই, কর্ত্তৃপক্ষ বাহির হইতে দেন নাই। ছোরা যেখানে অতর্কিতে আসিয়া বুকে বসে তখন সতর্কতার সম্বল লাঠি গাছ হাতে রাখিতে দোষ কি? কর্ত্তৃপক্ষ এমনি করিয়া নিরীহ লোকের লাঠি কাড়িতে পারিয়াছেন, গুণ্ডাদের গুপ্ত ছোরা ত কাড়িতে পারেন নাই! কোতোয়ালীর সম্মুখের জনতা যখন কিছুতেই পুলিশ নিরস্ত করিতে পারে না, তখন জনৈক

দারোগা একজন ভদ্রলোকের বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করিয়া দুর্বৃত্তদের তাড়ান। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেই বন্দুকটিও কাড়িয়া লইয়াছেন! আত্মরক্ষার 'অপরাধও' কি ঢাকাই কর্তৃপক্ষের অসহ্য?

কলিকাতার হাঙ্গামার পর সরকার অধিক সতর্ক হইবেন, আমরা আশা করিয়াছিলাম। দেখা গেল, সময় থাকিতে সরকার সতর্ক হইতে পারেন না।

* *
*

মেদিনীপুরের বন্যায় অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন। দেশবাসী যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া দুঃস্থ ভাইদের সাহায্য করিবেন, আশা করি।—এ দুর্ভাগা দেশে বন্যা যেন লাগিয়াই আছে! বন্যা মহামারী,—মহামারী ও বন্যা—

গত পূর্ব্ববঙ্গ সাইক্লোন্ ফণ্ডের বহু টাকা নাকি এখনো আছে। সে কত টাকা? যত টাকাই থাকুক, তাহার কিয়দংশ এই মেদিনীপুরের বন্যায় কি ব্যয় করা সম্ভব নহে? কেহ উত্তর দিবেন কি?

* *
*

স্বরাজ দলে ও প্রতিদানমূলক সহযোগী দলে আপোষ চেষ্টা চলিয়াছিল। চেষ্টা সফল হয় নাই। স্বরাজ দলের সদস্য মনোনয়ন ঠিক করা হইয়াছে।—ইহাও আপোষ না হইবার অন্যতম কারণ।

বাঙ্গলার স্বরাজ্য দলে ও কর্ম্মী-সংঘে আপোষ হওয়ায় একদিকে কতিপয় মুসলমান, অপর দিকে কতিপয় স্বরাজী সদস্য বিগড়াইয়াছেন। দেশাত্ম-বোধ এখনো অনেকের কাছেই বড় হইয়া উঠে নাই।

বাঙ্গলা কাউন্সিলের নির্ব্বাচনেও স্বরাজ্য দলের প্রাধান্য হইবে। কিন্তু মুসলমান অনেকে সাম্প্রদায়িক ভাবের ভাবুক হইবে। ফলে স্বরাজীদের মোটের উপর সংখ্যাধিক্য হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। হিসাব করিয়া দেখা যায়, ১৫।১৬টি মুসলমান ভোট তাহারা পাইলে তবেই কাউন্সিল আবার অচল করিতে পারিবেন। অবশ্য অচল করিলেও তাহা সচল হইতে সময় লাগে না।

আমাদের মনে হয়, কাউন্সিলের কার্য্যে সবখানি শক্তি ব্যয় না করিয়া কাউন্সিলের বাহিরের কার্য্যে তাহা নিয়োগ করিলে, সরকার অচল না হউক, আমরা সচল হইতাম।

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

—

'প্রলোভন' ছবিখানি আমরা 'প্রবাসী' পত্রিকার সৌজন্যে পাইয়াছি। সেজন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ। কিন্তু ভুলক্রমে ছবিখানির উপর সেকথা উল্লেখ করা হয় নাই। তজ্জন্য আমরা ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।—সম্পাদক।

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক, ৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত।

wrongly bound. p. 403-6 are bound
after Agrahayan p. 548

কার্ত্তিক, ১৩৩৩ সাল ১ম বর্ষ] [৭ম সংখ্যা

গোপন প্রিয়া

নজরুল ইস্‌লাম

পাইনি বলে আজো তোমায় বাস্‌ছি ভালো, রাণী !
মধ্যে সাগর, এ-পার ও-পার কর্‌ছি কানাকানি !
আমি এ-পার, তুমি ও-পার,
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার,
ও-পার হতে ছায়া-তরু দাও তুমি হাত্‌ছানি,
আমি মরু পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁওয়াখানি !

নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয়।
আমার বুকে কাঁদ্‌ছে আশা, তোমার বুকে ভয় !
এই-পারী ঢেউ বাদল-বায়ে
আছ্‌ড়ে পড়ে তোমার পায়ে,
আমার ঢেউ-এর দোলায় তোমার কর্‌লনা কূল ক্ষয়,
কূল ভেঙেছে আমার ধারে—তোমার ধারে নয় !

চেনার বন্ধু ! পেলাম্‌নাক জানার অবসর।
গানের পাখী বসেছিলাম দুদিন শাখার 'পর।
গান ফুরালে যাব যবে
গানের কথাই মনে রবে,
পাখী তখন থাক্‌বেনাক—থাক্‌বে পাখীর স্বর !
উড়্‌ব আমি, কাঁদ্‌বে তুমি ব্যথার বালুচর !

তোমার পায়ে বাজ্‌ল কখন্ আমার পারের ঢেউ,
অ-জানিতা ! কেউ জানেনা, জান্‌বেনাক কেউ।
উড়্‌তে গিয়ে পাখা হতে
একটী পালক পড়্‌লে পথে
ভুলে প্রিয় তুলে যেন খোঁপায় গুঁজে নেও !
ভয় কি সখি ? আপনি তুমি ফেল্‌বে খুলে এ-ও !

বর্ষা-ঝরা এম্‌নি প্রাতে আমার মত কি
ঝুর্‌বে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী!
মনের মনে নিশীথ্‌-রাতে
চুম্‌ দেবে কি কল্পনাতে?
স্বপ্ন দেখে উঠ্‌বে জেগে, ভাব্‌বে কত কি!
মেঘের সাথে কাঁদ্‌বে তুমি, আমার চাতকী!

দূরের প্রিয়া! পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদন্‌-রোল।
কূল মেলেনা—তাই দরিয়ায় উঠ্‌তেছে ঢেউ-দোল!
তোমায় পেলে থাম্‌ত বাঁশী,
আস্‌ত মরণ সর্ব্বনাশী।
পাইনিক তাই ভরে আছ আমার বুকের কোল।
বেণুর হিয়া শূন্য বলে উঠ্‌ছে বাঁশীর বোল।

বন্ধু, তুমি হাতের-কাছের সাথের-সাথী নও!
দূরে যত রও এ-হিয়ায় তত নিকট হও।
থাক্‌বে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মত চাঁদ্‌নী রাতে!
যত গোপন তত মধুর—নাইবা কথা কও!
শয়ন-সাথে রওনা তুমি নয়ন-পাতে রও!

ওগো আমার আড়াল-থাকা! ওগো স্বপন-চোর!
তুমি আছ আমি আছি এইত খুশী মোর।
কোথায় আছ কেম্‌নে রাণী,
কাজ কি খোঁজে, নাইবা জানি!
ভালোবাসি এই আনন্দে আপ্‌নি আছি ভোর!
চাইনা জাগা, থাকুক্‌ চোখে এম্‌নি ঘুমের ঘোর!

রাত্রে যখন এক্‌লা শোব—চাইবে তোমায় বুক,
নিবিড়-ঘন হবে যখন এক্‌লা থাকার দুখ,
দুখের সুরায় মস্ত্‌ হয়ে
থাক্‌বে এ-প্রাণ তোমায় লয়ে,
কল্পনাতে আঁক্‌ব তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ।
ঘুমে জাগায় জড়িয়ে রবে, সেইত চরম সুখ।

গাইব আমি, দূরে থেকে শুন্‌বে তুমি গান।
থাম্‌লে আমি—গান গাওয়াবে তোমার অভিমান।
শিল্পী আমি, আমি কবি,
তুমি আমার আঁকা ছবি,
আমার-লেখা কাব্য তুমি, আমার-রচা গান।
চাইবনাক, পরাণ ভরে করে যাব দান।

তোমার বুকে স্থান কোথা গো এ দূর্‌-বিরহীর,
কাজ কি জেনে—তল কেবা পায় অতল জলধির!
গোপন তুমি আস্‌লে নেমে
কাব্যে আমার, আমার প্রেমে,
এই-সে সুখে থাক্‌ব বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর?
দূরের পাখী—গান গেয়ে যাই, না-ই বাঁধিলাম নীড়!

বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাইবা পেলাম দান,
মনে আমায় কর্‌বেনাক—সেইত মনে স্থান!
যেদিন আমায় ভুল্‌তে গিয়ে
কর্‌বে মনে, সেদিন প্রিয়ে
ভোলার মাঝে উঠ্‌ব বেঁচে, সেইত আমার প্রাণ!
নাইবা পেলাম চেয়ে গেলাম গেয়ে গেলাম গান।

মহাযুদ্ধের ইতিহাস

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

* *

*

মাঠের ধান ঘরে আসিল।

পাঁড়েদের সেই জরো-ছেলেটাকে গাঁয়ের পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গেল। বছরের এই সময়টায় তাহার জ্বর ছাড়ে। দেবেন-পণ্ডিতের কুলগাছে কুল পাকে। বসন্তের হাওয়া বয়......

সে-বৎসর গ্রামের ভিতর বিস্তর রং-বেরঙের পাখীর আমদানী হইয়াছিল।

'ছুগগো-বাংলা'র পাঠশালাটি রাশু-ভট্‌চাজ্‌ই চালায়।

দেবেন-পণ্ডিত বাঁশের একটা নূতন তীর-ধনুক্ তৈরী করিয়াছে। উঠানের কুল-তলায় সে সারাদিন বসিয়া থাকে। মাকে বুঝাইয়া বলে, ইস্কুলে যে বড় খবরের কাগজটা আসে, তাহাতেই সে নাকি দেখিয়া আসিয়াছে,—'পিথিমি'র মধ্যে এ-বছর কুল আর কোথাও হয় নাই,—দেশ-বিদেশ হইতে তাই এত পাখীর আমদানী। আর......

"—সব-বেটা কুল খায়... .."

কিন্তু মিছাই আসিল। দেশে আর বাছাধনদের ফিরিয়া যাইতে হইবে না। দেবেন বলে,—

"অঙ্কেকের উপর আমি মেরেই ফেল্‌ব।"

কানা-বিষ্টুর বাঁজা-গাছটায় ছাড়া, গাঁয়ের প্রায় সব আমগাছেই তখন মুকুল ধরিয়াছে।

এমন দিনে রাখহরি-হরেকিষ্টর মোকদ্দমাটা হঠাৎ ফাঁসিয়া গেল। গণেশ-কিশোরীর কিছুই হইল না।

তাহাদের আনন্দ-আস্ফালনের আর সীমা রহিল না। গণেশ পাঁড়ে যার-তার কাছে গোঁফ চুম্‌রাইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল,—"আরও ক'শালার মাথা ফাটাই তোরা শুধু চেয়ে-চেয়ে ভাখ্।......আমার হবে কচু! আমার হবে ঘণ্টা!......"

নবীনের সর্ব্বাঙ্গ রাগে গুর্ গুর্ করে। বলে,—"তাই দেখাই যাক্।"

প্রাণের ভয়ে ভীরু দু'একটা গাঁয়ের লোক গণেশের কথায় সায় দেয়। নবীনের কানে সে-কথা আসে। তাহাদের কাছে ডাকিয়া বলে, "ভাল তোদের কস্মিন-কালেও হবে না তা জানি। এ-গাঁয়ের বাস তোরা উঠিয়ে দে, কোথাও চলে যা, বেরো আমার জমিদারী থেকে—। দূর্ হ'!"

নবীনের নামে পাল্টা-মোকদ্দমা গণেশ কম করে নাই। কিন্তু সাক্ষী-প্রমাণের অভাব,—সেটা তাহার বলা-কথা; কারণ, ধর্ম্মাধিকরণের কাছে বহুপূর্ব্বেই সে আর্জ্জি করিয়া রাখিয়াছে যে, জমিদার অত্যাচারী, বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে ঘর জ্বালাইয়া মারিয়া ফেলিবে, গ্রামের দরিদ্র প্রজা সে ভয় রাখে।

কিশোরী পাঁড়ে ইষ্টিশনের ফটকের চাকরিটি তখনও ছাড়ে নাই। খাবার ছুটি পাইয়া সে দিন সে ঘরে আসিয়াছে, গণেশ বলিল, "দে এবার তুই কিছু টাকা দে। আমি বহুৎ দিলাম। তিন চার শ' গেল আমার।"

"এ ত ভারি মুস্কিলে ফেল্‌লি তুই। টাকা আমি পাই কোথা?"

গণেশ বলিল, "ও সব বল্‌লে চল্‌বে না—ওসব বাজে-কথা আমি শুন্‌তে চাই না। মোকদ্দমা একা আমার নয়—তোর নামেও। টাকা চাই—টাকা দে, টাকা দে।"

পাঁচ-সাতটা মোকদ্দমায় আসামী হইয়া এখন আর সরিয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই। কিশোরী পাঁড়ে মহা ভাবনায় পড়িয়া গেল।

রান্নাঘর হইতে কিশোরীর বৌ-এর ঝনুঝনে' গলার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল।

"—ও মাগো! আয় রে বাঘ্ না গলায় লাগ্!

ভাসুরের কথা শুনলে কি হয়! কেনে, উ কেনে টাকা দিতে যাবে,—কিসের লেগে? লাগ্-লাগ্-ভেল্কি লাগাতে গেলি কেনে? নালিশ-মকদ্দমা করতে গেলি কেনে?"

"ট্যাক্-ট্যাক্ করিস না;—তুই চুপ কর্ শালী, তুই চুপ কর্।"

এই বলিয়া গণেশ তাহার ভাত্র-বধূকে চুপ করাইয়া দিয়া কিশোরীকে একটুখানি বাহিরে ডাকিয়া আনিল।

"আমার ত' এরই মধ্যে বিঘে-চারেক্ গেল,—দে তুইও দে চার বিঘে।"

কিশোরী কিছুতেই রাজি হয় না। বলে,—"খাব কি দাদা? জমি যে মোটে সাত বিঘে।"

গণেশ বলিল, "এ সময় তা বল্লে চলে না, আমারই কোন্ পঞ্চাশ বিগে! জেল-কয়েদ না হয় খাটতে রাজি আছি—কিন্তু নেমেছি যখন, শেষ পর্য্যন্ত লড়বই। আমরা জাত কম্বুজ্যে। আমাদের রাগ ভারি খারাপ।"

কিশোরীকে রাজি হইতে হইল।

"কিন্তু নেবে কে?"

গণেশ বলিল, "আমি নেব। আবার কে নেবে? লেনেওয়ালা-মরদ্ আবার কোন্-বেটা আছে রে এ-গাঁয়ে? ......জমি তুই চৈতনের মায়ের নামে লিখে দিবি। বাস্! জমি দিয়েই খালাস্! নালিশ করতে হয়, আপিল করতে হয়, আমি করব। মোকদ্দমা চালাতে হয়—আমি চালাব। চুরি করতে হয়, ডাকাতি করতে হয়—হাম করেঙ্গা। আল্‌বাৎ করেঙ্গা।—"

দিন-দুই পরে একদিন শহরের রেজেষ্ট্রী-আপিসে গিয়া জমি চার বিঘা কিশোরী লিখিয়া দিল বটে, কিন্তু বাকি তিন বিঘা জমিতে কি করিয়া যে কি হইবে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। বলিল,—

"শোন্ দাদা, শোন্ তবে এক মতলব শোন্ আমার। যা হবে তা একবারেই হয়ে যাক্। দিই ফুটিয়ে চল্ একদিন নব্‌নেকে শেষ করেই দেওয়া যাক্। বাস্...... হয় এস্পার, নয় ওস্পার!—"

প্রস্তাব শুনিয়া গণেশ পাঁড়ে লাফাইয়া উঠিল।

"ঠিক্! ঠিক্ বলেছিস্। জ্বালা-জঞ্জাল চুকে-বুকে' যাওয়াই ভাল। বাহা রে! বাহা রে!"

তৎক্ষণাৎ তাহাদের পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল এই—যে, হাবু রায় তাহাদের নামে যে মোকদ্দমাটি রুজু করিয়াছে, আগামী মঙ্গলবার তাহারই শেষ-শুনানির দিন। নবীন আদালতে যাইবেই, এবং সন্ধ্যার ট্রেণ ভিন্ন সে যে ফিরিতে পারিবে না ইহাও ঠিক। গণেশ কিশোরী তাহার আগেই আদালত হইতে চলিয়া আসিবে। হিঙ্গুলের তীরে গাছপালার ঝোঁপ-জঙ্গলের আড়ালে দু'তিনটা লোক লাঠি-সোটা লইয়া অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারে। তাহারাও থাকিবে। ষ্টেশন হইতে গ্রামে ফিরিবার ওই একমাত্র পথ, সুতরাং নবীনকে সেই রাস্তা দিয়া আসিতে হইবেই। হোক্ না জ্যোৎস্না রাত্রি......

গণেশ বলিল, "অমন চাঁদ আমি কত গণ্ডা দেখেছি··· চাঁদ-সুয্যি দুজনেই থাক্ না বাবা! ঠিক্—বাঘে যেমন করে' শিকেরটি ধরে' নিয়ে যায়, মুখে কাপড়টি চেপে' দিয়ে, ঠিক তেমনিটি করে' নিয়ে যাব—উ-ই পেসাদ্‌পুরের ডাঙ্গায়। তার পর খুব্‌লে খুব্‌লে কাটব, কেটে বস্তায় পুরব, পুরে' হিঙ্গুলের চোরাবালিতে পুঁতে দিয়ে—বাস্, হাত-পা ধুয়ে বাড়ী ফির্‌ব। জ্বালা-জঞ্জাল চুকে যাবে এক—দিনে।"

শশী মোড়ল আবার আসিল।

বলে—"চাষ করব আজ্ঞে······আবার।"

কুঁড়ি ধরিবার আগে বেলফুলের গাছগুলি সীতাপতি-বাবু একবার ছাঁটিয়া ফেলিতেছিলেন। গাছ-কাটা প্রকাণ্ড কাঁচিটা থামাইয়া শশীর মুখের পানে তাকাইয়া কহিলেন, "তুই সব্বই করবি।"

পশ্চিমমুখে শশী দাঁড়াইয়াছিল। সূর্য্যের আলো তাহার মুখে আসিয়া পড়িতেই সে তাঁহার একটুখানি কাছে সরিয়া আসিল। বলিল, "না হুজুর, নিশ্চয় করব

আমি। জমিটি আপনি আর-একবার দিন। কিন্তু এবার আর আলু-পেঁয়াজ নয়, এবার কচু। বিঘেয় তিনটি শ' টাকা লাভ।"

সীতাপতিবাবুর হাতের কাঁচি আবার চলিতে লাগিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "লাভ যা করবি তা আমি জানি। এ বুদ্ধিটি কে তোর মাথায় ঢোকালে বল্ দেখি?"

শশী বলিল, "শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলাম হুজুর, আজই ত ফিরছি সেখান থেকে।"

সীতাপতিবাবু আবার হাসিলেন, বলিলেন, "তাই বল।"

"আজ্ঞে হাঁ, এই ধান-চালের সময়টায় মেয়েছেলে সব রেখে দিয়ে এলাম সেইখানে। সুমুন্দিকে বললাম, 'বলি, শুন্‌ছো হে ভায়া, এখন আর এদের নিয়ে যেতে পারব না আমি, মামার ঘরে দিনকতক্ থাক্ ছেলেপুলে-গুলো।' বুঝ্‌লেন? তাতে সুমুন্দি বললে কি,—'বেশ ত' বেশ ত'।' আমিও বাঁচলাম হুজুর। খেয়ে-মেখে দিনকতক টিস্‌কিয়ে আসুক...... আমার সুমুন্দির—বুঝ্‌ছেন হুজুর—তিনখানা নাঙলের চাষ। ইয়া বড় বড় চার-পাঁচটা ধানের মরাই ঘরের উঠোনে। চার জোড়া চাষের বলদ,—বেটাদের শরীল্ কি হুজুর! কচুর চাষ করে' গেল-বছর চার শ' টাকা পেয়েছে আমার শালা—"

সীতাপতিবাবু বলিলেন, "বেশ, তাই কচুর চাষই কর্। গরুতে ছাগলে কচু খায় না বটে, কিন্তু যদি মানুষে খায়?"

শশী বলিল, "মাঠে কুঁড়ে বাঁধব হুজুর! এবার ত' পেছ্‌টান নাই, গায়ে আমার বাতাস লাগবে আজ্ঞে! আপদগুলোকে বিদেয় করে' এলাম ত' শুধু সেই জন্যেই।"

একটুখানি ভাবিয়া সীতাপতিবাবু বলিলেন, "জমি ত' ওখানে আমার অনেকখানাই আছে,—খানিকটা তুই কর্, খানিক্‌টা আমি করি। লোকে চুরি করতে তাহ'লেও একটুখানি ভয় করবে।"

আনন্দে শশীর মুখ দিয়া আর কথাই বাহির হইল না। গাছ-কাটা তখন প্রায় শেষ হইয়াছিল, কাঁচিটা রাখিয়া দিয়া সীতাপতিবাবু বলিলেন, "চল্ জমিটা একবার দেখেই আসা যাক্।"

শশী প্রস্তুত হইয়াই ছিল, বলিল "চলুন আজ্ঞে। কালই আমি তা'হলে একটা চিঠি লিখে দেব শালাকে। পোষ্টাপিস—নয়ান্‌কলমি। জেলাটা কোন্ জেলা হবে তা'লে হুজুর?"

সীতাপতিবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "দেখে বলে' দেব। চল্।"

পথ চলিতে চলিতে শশী বলিল, "এসে ত' দেখছি, গাঁয়ে খুব নালিশ-মকদ্দমা লেগে গেছে হুজুর,—আবার শুনছি নাকি আপনার সঙ্গেও—"

"হাঁ, আমার সঙ্গেও।"

শশী বলিল, "মরবার আগে পিপ্‌ড়ের ডানা বাঁধে আজ্ঞে, এইবার মরবে ঠিক। আর দেখুন, সেই যে আমার আলু পেঁয়াজ চুরি—সে আর কারো কাজ নয় হুজুর,—ওই ওরাই।"

সন্ধ্যার ট্রেণে নবীন আর সেদিন আদালত হইতে ফিরিল না, বোধকরি রাত্রির ট্রেণে ফিরিবে।

লাঠি, কুড়ুল ও একটা তলোয়ার চৈতন ঠিক সময়েই হিঙ্গুলের তীরে প্রকাণ্ড শিমুলগাছটার পাশে বাসক-বোয়ানের ঝোপের তলায় আনিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু উঠাউঠি দুইটা ট্রেণ পার হইয়া গেল—নবীন আসিল না, গণেশ-কিশোরী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল।

মাটি ও গাছের কথা উঠিলে সীতাপতিবাবুর জ্ঞান থাকে না। হাতের উপর এক মুঠা মাটি তুলিয়া লইয়া আঙুল দিয়া গুঁড়া করিতে করিতে তখনও তিনি শশীকে বুঝাইতে-ছিলেন, "বীজ যদি পুষ্টলো হয়, আর একটুখানি সার-গোবর পড়ে এই মাটিতে,—বাস্, তাহ'লে আর দেখতে হবে না, গাছকে ঠিক মাথা তুলে উঠ্‌তেই হবে—ফন্ ফন্ করে' ঠিক সাপের মত উঠ্‌বে, তেজ কি হবে গাছের! ......আসল কথা হচ্ছে, মাটটাকে একটুখানি আদর-যত্ন করতে হবে। ভাল না বাসলে কেউ কিছু দেয় না শশী,

কারও কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় না......মাটিই বা তোকে ফসলটি কেন দেবে বল্ দেখি, কেন দেবে সে?"

কথা কহিতে কহিতে হিঙ্গুলের উপর দিয়া তিনি বাড়ী ফিরিতেছিলেন।

নদীটি তখনও একেবারে শুকাইয়া যায় নাই, এবং সেই সামান্য জলের উপর উভয় তীরে বড়-ছোট নানা-রকমের গাছের সারি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রকাণ্ড একটা শিরিশ গাছে বিস্তর ফুল ফুটিয়াছিল।

দূরে একটা গাছের আড়ালে তখন চাঁদ উঠিতেছে।

সীতাপতিবাবু সেইখানে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "নদীটা এইখানে বাঁধতে হবে শশী! আর এই শিরিশ গাছের তলায় চুয়ো খুঁড়ে' একটা টেঁড়া বাঁধ্‌লেই মাঠে জল যাবে—কি বলিস?"

ঘাড় নাড়িয়া শশী বলিল, "সে-সব আমি ঠিক করে' নেব হুজুর—!"

সীতাপতিবাবু গাছগুলার দিকে তাকাইয়া ছিলেন। বলিলেন, "দাদার বুদ্ধি দেখ দেখি? বলে কিনা হিঙ্গুলের গাছগুলো কেটে বিক্রি করে' ফেল! তাই কাটে? তাই কাটে কখনও? কেটে দিলেই ত' সব ন্যাড়া-বুঁচো হয়ে গেল—রইল কি? ছোট হোক, বড় হোক, মাটিতে যে একবার জন্মালো .তাকে আর......কে! কে!......

পাশের একটা ঝোপের আড়াল হইতে দুইজন লোক বাহির হইয়া আসিল।

সীতাপতিবাবুকে দ্বিতীয় প্রশ্নের অবসর না দিয়াই গণেশ লাঠি চালাইল।

"লাগা তবে এই শালাকেই লাগা।"

কিশোরীও লাঠি তুলিল।

ডান হাতখানি তুলিয়া দিয়া সীতাপতিবাবু মাথা বাঁচাইলেন।

কিন্তু হাত ভাঙিল।

"উ—স!"—বলিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

শশী তখন প্রাণপণে চীৎকার সুরু করিয়াছে—

"ওরে মেরে ফেল্‌লে রে! কে আছিস্ রে! ডাকাত রে! ছুটে আয়! ছুটে আয়!"

গণেশ তাহাকে চুপ করাইবার জন্য দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে এক লাঠি মারিল, কিন্তু সে চুপ করিল না; মার খাইয়াও চেঁচাইতে লাগিল।

কিশোরীও তাহার উপর আর এক লাঠি চালাইল।

কিন্তু তবু তাহার চীৎকার থামিল না।

তলোয়ারখানা হাতে লইয়া চৈতন আগাইয়া আসিতেই গণেশ বলিল, "চলে আয় বেটা, এগিয়ে আয়! এগিয়ে আয়!"

হাতিয়ার লইয়া চৈতন আগাইয়া আসিতেই গণেশ বলিল, "লাগা, এই চাষা-বেটাকেই আগে। শালা চেঁচায়।"

চৈতন চোট চালাইল।

শশীর পায়ের মাংস খানিকটা ঝুলিয়া পড়িতেই সে আরও জোরে চীৎকার সুরু করিল।

গণেশ তাহার মুখখানা চাপিয়া ধরিল। বলিল, "লাগা এবার।"

কিশোরী চৈতন দুজনেই একসঙ্গে তাহাকে একেবারে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু চীৎকার তাহার ব্যর্থ হয় নাই। ষ্টেশন হইতে কতকগুলো লোক বোধকরি সেই পথ ধরিয়াই আসিতেছিল, হিঙ্গুলের ও-পারে সহসা তাহাদের হল্লা শুনিতে পাওয়া গেল।

আদালত হইতে সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া নবীন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমন যে হইবে তাহা সে কোন দিন ভাবিতেও পারে নাই।

সীতাপতিবাবু খাটের উপর শুইয়া ছিলেন। হাতে তাঁহার সেক দেওয়া চলিতেছিল। ডাক্তার আনিবার জন্য ষ্টেশনে লোক গিয়াছে। ফটিক শুধু শিয়রের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া একদৃষ্টে দাদুর মুখের পানে তাকাইয়া ছিল।

বাহিরে আর একটা খাটের উপর শশীর শুশ্রূষা চলিতেছে!

নবীনকে দেখিয়া সীতাপতিবাবু বলিয়া উঠিলেন, "শেষ পর্য্যন্ত এই হলো বাবা, বুড়ো বয়সে......"

গলাটা তাঁহার বন্ধ হইয়া আসিল। চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

নবীনের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। পাশের ঘরে তাহাদের পাশ-করা দো-নলা বন্দুকটি থাকিত। নবীন ঘরে ঢুকিয়া টোটা সমেত ধীরে-ধীরে তাহাই বাহির করিয়া আনিল।

বন্দুক দেখিয়া সীতাপতিবাবু চমকিয়া উঠিলেন।

"কি হবে, কি হবে, ও কি হবে কি?"

"কিছু হবে না।"—বলিয়া নবীন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল।

"নবীন!"

সীতাপতিবাবু বিছানা হইতে মাথা তুলিয়া একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না,—বালিশের উপর মাথাটা তাঁহার আবার লুটাইয়া পড়িল। আবার ডাকিলেন—

"নবীন! নবীন!"

নবীন ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল,

"গুলি করব। তাদের প্রত্যেককে খুন করব আজ—মেয়ে, ছেলে সব...... ।"

মাথা নাড়িয়া সীতাপতিবাবু ডাকিলেন,

"শোন্!......কাছে আয়।"

বহুকাল পরে এত বড় স্নেহের আহ্বান নবীন আজ আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"রাখ্......বন্দুক রাখ্। ছি—।"

নবীন বলিল, "কেন মিছে......আপনি জানেন না।"

সীতাপতিবাবু কহিলেন, "জানি। মানুষ খুন করার চেয়ে বড় পাপ আর দুনিয়ায় কিছু নেই......জানি। আমায় খুন করেছে......এর শাস্তি......ওদের ভগবান দেবেন।"

রাগে নবীনের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, নিজেকে সে আর সামলাইতে পারিল না, বলিল,

"ভগবান নেই!"

চওড়া বুকখানা তাহার ঘন-ঘন দুলিতে লাগিল।

সীতাপতিবাবু আবার তেমনি ধীর শান্তকণ্ঠে কহিলেন,

"আছেন......নবীন, বিশ্বাস কর্......আছেন।"

বলিয়াই তিনি একবার ঢোঁক গিলিয়া চোখ বুজিলেন।

একটুখানি থামিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "নালিশ-মোকদ্দমা যেমন চলছে চলুক। আমার ......আমার মনে হয়......তাও চালিয়ে কাজ নেই।"

নবীনের আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না, বলিল, "এক্ষুনি চল্‌লাম।"

"কোথায়?"

নবীন বলিল, "পুলিশ-সাহেবের কাছে। ওদের চালান্ দিতে হবে। 'এ্যারেষ্ট্' করাতে হবে।"

সীতাপতিবাবু বলিলেন, "এইমাত্র এলি, আজ না বাবা—কাল যাস্।"

"না। এক্ষুনি—আজ রাত্রেই!......মহতাপ!"

দরজা খুলিয়া নবীন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সমস্ত গ্রামের আবহাওয়া সে এক অত্যাশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে।

রাস্তার ধারে শিব-দেউলের সেই উঁচু রকের উপর নবীন সেদিন চুপ করিয়া বসিয়া ছিল,—হাতে একটা বেতের চাবুক। আজকাল এই চাবুকটা তাহার হাতেই থাকে। কাহারও সহিত বড়-একটা কথা কয় না।

কেনারাম মুখুজ্যে সেই পথ দিয়া কোথায় যাইতেছিল, নবীনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। চোখ মিট্ মিট্ করিতে করিতে বলিল, "বসে আছ বাবা?"

নবীন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "হুঁ।"

মুখুজ্যে বলিল, "টিকে-ওয়ালা এসেছে আমাদের গাঁয়ে। বলে, ছেলেবুড়ো সব টিকে নিতে হবে—শহরে বসন্ত হচ্ছে। আরে, শহরে বসন্ত হলো ত' আমাদের কি? আমরা বলে নিজের জ্বালায় অস্থির,—টিকে নিচ্ছে! আর সে-রকম টিকেই বা এখন পাবে কোথায়? সে সব বাংলা-টিকে—আমাদের আমলে ছিল। এই ভাখো—দাগ এখনও জল্-জল্ করছে, কাঠে আগুনে না হওয়া পর্য্যন্ত এ দাগ আর সহজে উঠ্‌ছে না বাবা!"

সে তাহার বাঁ হাতের উপর বসন্তের একটা টিকার দাগ নবীনকে দেখাইয়া দিল। বলিল,

"শুনছি নাকি ছেলেগুলোকে জোর করে ধরে-বেঁধে টিকে দিয়ে দিচ্ছে। কেন রে বাপু? এত ভাল জোর করে' কাজ কি? যার হবে তার হবে। কপালে যার আছে তার হবেই, টিকে দিলেও হবে না দিলেও হবে। —দেখা হলে তুমি একবার ওকে বারণ করে দিও ত বাবা। বলো আমাদের গাঁয়ে টিকে কেউ নেবে না—তুমি যাও। ছেলেগুলো আমাদের ভয়ে মরছে, কাল থেকে এক রকম ঘরেই পোরা রয়েছে—বেরোতে পায়নি, বুঝলে? তাতেও না যায়, আমি দিয়ে আসব এক নম্বর নালিশ করে ওর নামে,—জোর করে টিকে দেওয়া ওর বার করব।"

রাগের ঝোঁকে অবস্থা তাহার অত্যন্ত খারাপ হইয়া আসিল।

কেনারাম চলিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাল কথা। যে জন্যে এলাম সেই কাজটাই ভুলে যাচ্ছি।—আচ্ছা, উকীল মুক্তিয়াররা কি বলে? বেটাদের সাজা-টাজা কিছু হবে? জন্মের মতন ডিপ-চালান করে দেয়,—তবে ত জানি হ্যাঁ, হলো কিছু। দিনের পর দিনই ত শুধু পড়ছে, বেটারা বিচের টিচের করতে জানে না, নাকি!"

নবীন চুপ করিয়া রহিল।

কেনারাম আবার বলিল, "ও-সবের দফাটি একবারে নিকেশ করে' দেওয়াই ভাল, বুঝলে বাপ্। এতে পাপ নেই। দেবতার থানে পশু বধ করি আমরা—এও সেই পশু বধেরই সামিল।"

বিষণ দে পার হইয়া যাইতেছিল, নবীনকে দেখিয়া সেও একটি নমস্কার করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া পড়িল।

"বসে' আছেন আজ্ঞে?"

নবীন বলিল, "তোমার মনে আছে ত বিষণ? পরশু তোমার সাক্ষীর দিন আছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে আমি দেয়ালের উপর গোবর দিয়ে ডাড়ি কেটে রেখেছি আজ্ঞে! আমার ছেলেই সব ইঞ্জিরি তারিখ টারিখের খবর রাখে,—যতই হোক্, পেটে দু-আখর পড়েছে ত,—না, কি বলেন মুখুজ্যে?—এই চারটি আম আনতে গিয়েছিলাম—দীনুর গাছে।"

বিষণ তাহার খাটো কাপড়ের খুঁটে বাঁধা আমগুলি দেখাইয়া বলিল, "কচি আমের গুড়-অম্বল খেতে বেশ, কিন্তু এ বচ্ছর কি আর খাওয়া হলো কিছু—এই হেঙ্গামা নিয়েই গেল। কচি নিমের পাতা ভেবেছিলাম খাব, কিন্তু আর হলো কই? সেদিন দেখি না আশু নাপিতের গাছের পাতাগুলি সব এরই মধ্যে বড় হয়ে গেছে। আর আমগুলো কি আর কচি আছে? এই দেখ না—আঁটি বেঁধে' গেছে এরই মধ্যে।"

কেনারাম তাহার ঝাপসা চোখের সুমুখে আমটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "আর না বাঁধে? গাছের ফলেরই বা দোষ কি? চোত পেরিয়ে বোশেখে পড়তে চললো,—দেখতে-দেখতে কি রকম গরম পড়ে গেল দেখেছ?......দাও, একটা যখন দিলে তখন আর দুটোই দাও! তরকারির সুখের ত' আর সীমে নেই,—গুড়-অম্বল আমারও হোক......"

বৈশাখ মাস ব্রাহ্মণ মাস।

গ্রামের ছোকরার দল খোল করতাল বাজাইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সমস্ত গ্রামখানাকে মাতাইয়া তোলে, গাঁয়ের পথে

পথে সকলে মিলিয়া নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

অঘোর দালালের খোল করতাল সম্বৎসর ধরিয়া দেওয়ালের গায়ে টাঙানো থাকে, এই সময় ধূলা ঝাড়িয়া তাহাদের নামানো হয়। কিন্তু সে বৎসর দেওয়াল হইতে তাহারা আর নামিল না।

মন্থ পৈতণ্ডী তাহাকে সংকীর্ত্তনের কথা বলিতে গিয়াছিল। অঘোর বলে,

"দিনের বেলায় বিয়েনো গাঁয়ে কাপড় বেচতে যেতাম তা-ই ছেড়ে দিলাম ;—এ ত' রাত! ও-ই তোলা আছে বাজাতে পার ত' নিয়ে যাও।"

সেদিন খঞ্জনিদার রাখু বোরেগী বলিল, "রাত-বিরেতে আমি আর বেরোই না দাদা! সন্ধ্যে হলেই আমার ঘরে খিল পড়ে—তুমি না হয় দেখে' যেও একদিন।"

বেনোয়ারী ওস্তাদ তাহার এক মাসীর বাড়ীতে মাসাধিককাল বসিয়া আছে। লোকে জানে, যাত্রার দলে ঠিকা-চুক্তিতে এখনও তাহার বেহালা বাজানো চলিতেছে।

পাঁড়ে-পাড়ার পাশে পুরাণো একটা অশ্বথ গাছের তলায় পাতাল-ফোড়্ পাথরের একটি শিব আছেন—ফণী-মনসা কাঁটার বেড়া দিয়া ঘেরা। বৈশাখের শেষ দিন, অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া, গ্রামের ছেলেবুড়া সকলকেই এই শিবের মাথায় এক ঘটি করিয়া জল ঢালিয়া বুড়া-বাবাকে ঠাণ্ডা করিয়া আসিতে হয়। না আসিলে গ্রামে সে বৎসর দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া ওঠে, আকাশে মেঘগুলা মিছামিছি ঘুরিয়া বেড়ায়, মেঘে জল থাকে না, অনাবৃষ্টির দরুণ আবাদী জমিগুলি চাষের সময়েও শুকনো-ডাঙ্গার মত খাঁ খাঁ করিতে থাকে।

ঘরের কাছে পাইয়া গণেশ কিশোরী যে কাহাকেও বাদ দিবে না একথা ঠিক, অথচ বৈশাখের সংক্রান্তি আসন্নপ্রায় ; নবীনের কাছে ঘন-ঘন লোকজনের আসা-যাওয়া সুরু হইল।

নবীন বলিল, "আমি কি করব? দুর্ভিক্ষ হয় ত হোক্।"

আশু মুখুটী বলিলেন, "তোমার কি বাবা, অ-ঢের টাকা-পয়সা, 'দুখ-ভিক' হলে আমাদেরই সর্ব্বনাশ। তার চেয়ে আমি বলি কি, গাঁয়ে একটা ঢোল-সরহদ্দ করে' দাও— যে, সেদিন পূব্‌দিকে সূয্যিটি ঠিক লাল বরণ হবে, আর সব ঠিক একসঙ্গে—ছেলে-বুড়ো সব ঠিক একই সময়ে—এক জোট হয়ে ঘড়ির ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ......বাস্! মার খায় ত খাবে সব একসঙ্গেই! আর এতগুলো লোক থাকব আমরা—মার কি অমনি মুখের কথা কিনা! মার যেন কত পড়ে থাকে পথের ধূলোয়!..."

নবীন কোনও কথাই বলিল না।

হাবু রায় কাছেই ছিল, বলিল, "আপনার মাথায় ত' এই বুদ্ধি হলো, আচ্ছা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি দেখুন...।" এবং ঠিক সে করিয়াও দিল।

সেই দিনই ষোল-আনা গ্রামের লোকের সহি লইয়া মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের কাছে এই বলিয়া একটি আর্জ্জি পেশ্ করিয়া আসিল যে, আগামী বৈশাখ-সংক্রান্তির দিন গ্রামে তাহাদের একটি উৎসব আছে। উৎসবটি তাহাদের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের অনুষ্ঠিত, এবং সে উৎসবটি যাহাতে না হয়, গ্রামের দুষ্ট ব্যক্তি গণেশ ও কিশোরী পাঁড়ে ভিতরে-ভিতরে তাহারই আয়োজন করিয়াছে। তাহাদেরই দরজা দিয়া সেদিন সকলকে পার হইয়া যাইতে হইবে, সুতরাং গ্রামের মধ্যে ভীষণ একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অশান্তি-উপদ্রবের আশঙ্কা আমরা সকলেই করিতেছি। উক্ত দিবস হুজুর যদি সশস্ত্র পুলিশ কর্ম্মচারী দিয়া গ্রামের দরিদ্র প্রজামণ্ডলীকে সাহায্য না করেন তাহা হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। ইত্যাদি।

সংক্রান্তির পূর্ব্বরাত্রি প্রভাত হইতে-না-হইতেই মহকুমা হইতে পাঁচজন বন্দুকধারী সিপাহী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালো রঙের মোটা চামড়ার বুটজুতাগুলা তাহাদের পায়ে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করিয়া ডাকিতেছিল।

এবং সেই সিপাহী পরিবৃত হইয়া গ্রামের লোক নির্ব্বিঘ্নে সেদিন বুড়া-শিবের মাথায় জল ঢালিয়া আসিল।

ফিরিবার পথে পানু গাঙ্গুলী একজন সিপাহীর অত্যন্ত কাছ ঘেঁসিয়াই চলিতেছিল। গণেশ পাঁড়ের দরজার কাছাকাছি আসিয়া সিপাহীকে সে অত্যন্ত সন্তর্পণে অথচ জোরের সহিত কহিল, "ওটা কি তুমি আমাদের দেখাবার জন্যে এনেছ নাকি? দাও না, এইখানে ফুটিয়ে দাও না একটা, আওয়াজ হোক্, বেটা চমকে উঠুক!...কি হে! তোমরা কোনও কাজেরই নও দেখছি যে!..."

যে কোন রকমেই হোক্, বুড়া-শিবের মাথায় জল সে-বৎসর অনেক পড়িল, কিন্তু তথাপি দরিদ্র গ্রামবাসীর উপর রাগ যে তাঁহার কেন পড়িল না কে জানে!

জ্যৈষ্ঠ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আকাশে মেঘ আছে, অথচ বৃষ্টি নাই।

গ্রামের অনেক পুকুর শুকাইয়া গেল। পানীয়ের অত্যন্ত অভাব। চারিদিক খাঁ খাঁ করে। দুপুরে আগুনের হল্কা বয়।

মাঝে-মাঝে যৎসামান্য যে বৃষ্টিটুকু হয়, মাঠে লাঙল দেওয়া দূরে থাকুক্—পথের ধূলাও তাহাতে ভিজে না।

সে বৎসর সকলকেই যে না খাইয়া শুকাইয়া মরিতে হইবে সে আশঙ্কা অনেকেই করিতে লাগিল এবং ইহা যে শুধু এই হতভাগা পাঁড়েদের পাপের মাত্রা অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই—ইহাও সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল।

বৃষ্টি নামিল আষাঢ়ের প্রথমে। কিন্তু জলো-হাওয়ার আমেজ লাগিয়া হাকিমদের মাথাগুলাও ঠিক এই সময়েই সাফ্ হইয়া গেল। ঘন ঘন মোকদ্দমার দিন পড়িতে লাগিল।

ষষ্ঠি নিয়োগী সেদিন নবীনকে বলিল, "কাউকে কিছু বলেটলে দিয়ে মোকদ্দমার দিনগুলো এই সময় কিছু কম-সম করে' ফেলাও ভায়া, একে নামি চাষ, তার উপর মাঠ-ঘাট যদি দেখতেই না পাওয়া গেল, তাহ'লেই ত দফাটি আমাদের কাবার।"

নবীন বলিল, "জানি নে।—আমায় কেউ কিছু বলতে এসো না ভাই এ-সময়, কারও কথা আমি রাখতে পারব না। মোকদ্দমা শেষ হোক্, তারপর যা হয় হবে।"

"শেষ হতে-হতেই যে..."

নবীন বলিল, "তোমাদের ভাল করতে গিয়েই আমার এই বিপদ। তোমাদের জন্যেই বুড়ো বাবাকে মার খাওয়ালাম......তোমাদের জন্যেই......" বলিতে বলিতে গলাটা তাহার ধরিয়া আসিল।

হরি মাইতি সেদিন তাহার কৃষাণকে সঙ্গে আনিয়া নবীনের কাছে আসিয়া পড়িল।

"দেখুন বাবু, কাজ দেখুন ব্যাটার! আদালতে সেদিন যাবার আগে এই বেটাকে বলে গেলাম জমির রসে রসে এই সময় চাষ দিয়ে রাখিস্। বাস্! ফিরে এসে' দেখি, কোথাকার কি, কোথায় চাষ, কোথায় লাঙল—নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে বেটা! মাঠের 'বতর্' শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে হুজুর, আপনার দায়ে আমার সব গেল... এই নালিশ-মকদ্দমার জন্যে......"

হাতের বেতখানা তুলিয়া লইয়া নবীন লাফাইয়া উঠিল, "বেরো হারামজাদা, আমার সুমুখ থেকে বেরো—! যেতে হবে না তোকে আমার সাক্ষী দিতে, হারামজাদা, পাজি, ছুঁচো, ষ্টুপিড্! আমার দায়ে? চাষ গেল আমার দায়ে? গাধা, ষ্টুপিড্!......"

নেপাল মুচির অসুখ গত কয়েকদিন হইতেই একটু-খানি বাড়িয়াছিল। আষাঢ়ের শেষাশেষি হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলা কাশিতে কাশিতে মুখে রক্ত উঠিয়া সে মারা গেল।

তাহার মোকদ্দমার বিচার তখনও শেষ হয় নাই।

গ্রামের দুচারজন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া গেল, গণেশ যখন তাহাকে খামারে ডাকিয়া লইয়া গিয়া মারিতে-ছিল, সেও তখন গণেশকে দু'এক ঘা বসাইয়া দিতে কসুর করে নাই, এবং হাজার হোক, মুচি হইয়া ব্রাহ্মণকে মার,—ছ'মাস পার হইল না, মুখে রক্ত উঠিয়া শেষ হইয়া গেল...

এবং এই মারের ব্যাপারটা তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে;

এতদিন কাহারও কাছে প্রকাশ করে নাই, নেপাল শুধু বাঁচিয়াছিল বলিয়াই।

শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে আদালতে নেপালের মোকদ্দমা আবার উঠিল। নেপাল মুচি ও গণেশ পাঁড়ের ডাক হইল। নেপাল সে ডাক শুনিতে পাইল না, কিন্তু বিচার তাহার সেইদিনই শেষ হইয়া গেল। গণেশকে কুড়িদিন জেল খাটিতে হইবে......

সংবাদটা যখন গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল, নেপালের বৌ তখন দিন আট-দশ জ্বরে ভুগিয়া সবেমাত্র সারিয়া উঠিয়াছে।

গণেশের জেলের খবর হরেকিষ্ট রাখহরির কাণে পৌঁছিতে দেরী হইল না, নবীনের কাছে তৎক্ষণাৎ তাহারা যেন হাওয়ার বেগে ছুটিয়া আসিল।

রাখহরি বলিল, "যাবে কোথা ভায়া, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। আমার বেলায় নাহয় ফস্কালে কোনরকমে, কিন্তু এবার—!"

হরেকিষ্ট সে কথা বলিল না। বলিল, "কুড়ি দিন—এমন আর কি বেশি হলো আজ্ঞে? ছ'ছটো বাঘে খেয়ে এলে যায় ওর ওই হাতীর মত শরীর,—কুড়ি দিন ঘানি টেনে কি আর এমন ঝটকাবে হুজুর?......আচ্ছা হোক্, হোক্. ফিরে' ত' আস্‌বেই,—ফাঁকে যে আমি ওকে পাচ্ছি না কোনদিন......"

মহতাপ কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল।

নবীন তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল। বলিল, "ও।—আচ্ছা রাখহরি তোমার ঘর থেকে শলিখানেক চাল আজ আমায় ধার দিতে পার? কাল-পরশু দিয়ে দেব।"

তৎক্ষণাৎ রাখহরি জবাব দিল, "ওইটি মাপ্ করবে ভায়া, থালা, ঘটি, বাটি সাবল, কুড়ুল কোদাল, ফাল, যা-কিছু চাও দিতে পারি, কিন্তু চা—ল ভায়া, চাষের অবস্থা ত' এবছর হটটম্বা, তার উপর ওই যে আমার বঙ্কিমানন্দ ভায়া, ওই যে ক্ষ্যাপা সেজে থাকেন, চাল-ধান সব বেচেখুচে' ছন্দোযুটো ধরিয়ে দিলে......চাল কি হবে ভায়া, তোমার আবার চালের কি দরকার?"

হরেকিষ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "দশ-বিশ সের চাল—এত যেদিন খুসী···যখন খুসী···চাল আপনি কি ক[illegible] যেন আজ্ঞে?"

নবীন সে কথার কোনও জবাব দিল না। ম[illegible]তাপকে বলিল, "যাও, সজনী দত্তর দোকানে যা[illegible] বুঝলে? আমার নাম করে' বল গিয়ে তাহ'লেই দেবে[illegible] তারপর নিজে গিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে এস ও[illegible] ঘরে। বলো যে তুই ভাবিস নে, কিছু ভাবনা নে[illegible] তোর।"

মহতাপ চলিয়া গেলে রাখহরি প্রশ্ন করিয়া বলিল, "কে, কাকে ভায়া কাকে?"

নবীন অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে বলিল, "কাউকে[illegible] না।"

বলিয়াই সে গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

কথাটাকে পাল্টাইয়া দিবার জন্য রাখহরি তৎক্ষণা[illegible] ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কুড়ি কুড়ি' দিন মেয়াদ হলো ভায়া[illegible]—নেপা বেটা বেঁচে থাকলে বেশ হতো কিন্তু···"

জেল হইতে ফিরিয়া গণেশ এবার খুব বেশি[illegible] আস্ফালন করিতে পারিল না।

স্ত্রী বলিল, "চাল ধান টাকা পয়সা ঘরে আর এক[illegible] নেই—তুমি কয়েদ খাট আর আমরা উপোস দিই।"

গণেশ বলিল, "তুই আমার বৌ-ই ন'স হারামজাদী, আমার কাছে বল্‌লি সে-ই ভাল, খবরদার আর কারও কাছে বলিসনে একথা।"

গণেশকে আবার মদনপুরের তারিণীবাবুর কাছে[illegible] ছুটিতে হইল। বাকী পনর বিঘা জমির মধ্যে দশ বিঘা[illegible] আবার বন্ধক দিল।

নগদ পাঁচ-শ' টাকা হাতে পাইয়া গণেশ বলিল, "ব[illegible] মোকদ্দমাটা কেমন করে' ফাঁসিয়ে দিই এইবার তুই[illegible] ছাখ বসে বসে।"

চৈতনের মা বলিল, "এ-বছর চাষ-টাস কিছু হয়নি[illegible] মনে থাকে যেন।"

গণেশ একটুখানি রসিকতা করিয়া তাহার স্ত্রীকে[illegible]

খাইয়া বলিল যে, জেলখানার লপ্‌সি-ঘাঁটা তাহার পক্ষে অতি উপাদেয় খাদ্য, চাষ না হইলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই, এবং তাহারা জাত কমুজ্যে, চাষ-বাসের ভাবনা তাহারা ভাবে না।

ছোট-খাট মোকদ্দমাগুলির বিচার যখন শেষ হইল গ্রামের তিনটি দুর্গা প্রতিমায় তখন মাটি পড়িতেছে। পূজা সে-বৎসর কার্ত্তিকের প্রথমে।

সবগুলা জড়াইয়া গোটা-পঞ্চাশেক টাকা জরিমানা গণেশ আদালতে দাখিল করিয়া আসিল।

কিশোরী বলিল, "আমার জরিমানার টাকাটা দিলি না যে দাদা?"

গণেশের হাত তখন প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছে, বলিল, "তোর টাকা তুই দিগে, না পারিস, জেল খেটে আয়, আমি খাটলাম কি করে?"

জবাব শুনিয়া কিশোরীর মনটা ভারি খারাপ হইয়া গেল, বলিল, "তোর সঙ্গে আর যদি কখনও কাজে নামি ত এই—রাম, দুই, তিন।"

কিশোরী নিজের কাণ মলিয়া শপথ করিল।

গণেশ বলিল, "তোর বাপ নাম্‌বে, তোর হাড় নাম্‌বে। আমার হাতে এখনও বড় মোকদ্দমা—সে খবর রাখিস্‌? তোর ট্যাঁকৃটেকে বৌ-শালীকে সম্বচ্ছর খেতে দিতে হবে—সে খবর রাখিস্‌?"

জরিমানার টাকা দিতে না পারিয়া দিন-কতকের জন্য কিশোরী জেলে গেল।

সীতাপতিবাবুর হাত-ভাঙ্গা মোকদ্দমাটার এজাহার জবানবন্দী প্রায়ই শেষ হইয়া আসিয়াছে, দু-পাঁচদিনের মধ্যেই যা-হোক্‌ একটা-কিছু হুকুম হইয়া যাইবে, এমন সময় গণেশ এক ভারি মজার ব্যাপার করিয়া বসিল।

হাতে টাকা নাই, অথচ বড় দরের একটা উকিল দিতে না পারিলে বিশেষ সুবিধা হইবে না। বড় আদালতে গণেশ এই বলিয়া এক আর্জ্জি পেশ্‌ করিল যে, থানার পুলিশ-কনেষ্টবল হইতে আরম্ভ করিয়া মহকুমার বড় ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেব পর্য্যন্ত জমিদারের কাছে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘুষ খাইয়াছে, সুতরাং তাহার এই মোকদ্দমাটির অন্যত্র বিচার না হইলে তাহার পক্ষে সুবিচারের আর কোনও আশা-ভরসা নাই।

মোকদ্দমাটি দায়রা সোপরদ্দ হইয়া গেল।

দায়রায় তখন একটা ডাকাতি মোকদ্দমার বিচার চলিতেছে। গণেশ দিনকতকের সময় পাইল।

পাঁচ বিঘা জমি মাত্র বাকি, তাহাও আবার ধীরেন ভট্‌চাজের দেওয়া—সঙ্গে একটি ঠাকুর-সেবা আছে। ঠাকুর সেবার কথাটা বেমালুম উড়াইয়া দিয়া গণেশ আবার তারিণীবাবুর কাছে গিয়া গড়াগড়ি দিয়া পড়িল।

—হুজুর না দিলে আর উপায় নাই। পাঁচ বিঘা নাখ্‌রাজ জমি, চার শ' টাকা তাহার চাই-ই। না দিলে মেয়ে-ছেলে লইয়া উপবাস দিয়া তাহাকে মরিতে হয়।

পূজার আগেই জুরির বিচার শেষ হইল।

...জমিদার সাধারণত অত্যাচারীই হইয়া থাকে... এবং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বড়-একটা হয় না। মোকদ্দমাটি আগাগোড়া জমিদারের সাজানো বলিয়াই বিশ্বাস, সুতরাং অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন জুরিদের বিচারে আসামী তিনজন বেকসুর খালাস পাইল।

গণেশ, কিশোরী, চৈতন, সেদিন আর পায়ে হাঁটিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিল না।

দূরের শহর হইতে ট্যাক্সি-মোটরগাড়ীটা জমিদারের দরজা দিয়া সশব্দে গ্রামে আসিয়া ঢুকিল, এবং তাহাদের বিজয়োল্লাসে সমস্ত গ্রামখানা থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পূজা আসিল।

লোকজন দেখিলেই হরি কোব্‌রেজের চোখ দিয়া দর্‌ দর্‌ করিয়া জল গড়াইয়া আসে। বলে, "পিতিমে-পুজো এ-বছর আর হলো না দাদা, ঘট-পুজোই হোক্‌। পয়সা-কড়ির বড় টানাটানি।"

বঙ্কিমানন্দ বলে, "ও-বেটির পুজো না করাই উচিত। ওর সেই স্বামী-বেটাই হচ্ছে—বাবার বাবা তস্য বাবা!"

কপিল চক্কোত্তির আনন্দ আর ধরে না...বাঁশের কঞ্চি তাহার হাতেই থাকে। বলে, "কারও পড়া হয়নি এ-বছর,—কার্ত্তিক, গণেশ, বাঘ, অসুর, লক্ষ্মী, সরস্বতী—কারও না! পুজোর ছুটিটা এমনিই কাটালে,—পুরণো পড়া, হেণ্ড-রাইটিং,—কিচ্ছু করেনি; সব মার খাবে, মারের চোটে ভূত ভাগিয়ে দেব আমি..."

বিজয়া দশমী...

প্রতিমা-বিসর্জ্জন কোন্ সময় হইয়া গেছে কে জানে!

বিসর্জ্জনের পর গ্রামের লোক ঘরে-ঘরে প্রণাম করিতে বাহির হয়। গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে তাল-তেঁতুলের ছোট একটি বাগানের ভিতর, বহু প্রাচীন জরাজীর্ণ একটি মন্দিরে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রঙ্কিণীকে সকলেই প্রথমে প্রণাম করিয়া আসে।

নবীন উঠিল। সিদ্ধির নেশায় মাথাটা তখন তাহার অত্যন্ত ঘুরিতেছে।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে।

গ্রামের পথে গোকুল চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা। অত্যন্ত রোগা কঙ্কালসার এই লোকটি পড়াশ্‌কোলে সামান্য একটি পাঠশালা করিয়া সংসার চালায়।

গোকুল বলিল, "এই যে ভায়া, এসো, কোলাকুলি করি।"

নবীন তাহার সেই শীর্ণ দেহটি সাগ্রহে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল।

গোকুল বলিল, "নাঃ, পেন্নাম ক'রে আর সুখ নেই ভায়া! মিঠাই-সন্দেশ দিতে হবে বলে' সব-বেটা দোরে খিল্ লাগিয়েছে। মোটে এই চার গণ্ডা পাওয়া গেল, আর এই খিলি-দুই পান। চললাম ভায়া, তোমার ঘরেই চললাম।"

"যাও।"—বলিয়া নবীন আগাইয়া গেল।

পথে আর কাহারও সাড়াশব্দ নাই। ঘরে-ঘরে খিল পড়িয়াছে সত্য। দু'পাশে আগাছার জঙ্গল। যেখানে-সেখানে ফণী-মনসার ঝোঁপ। ভাঙা প্রাচীর-ঘেরা পড়ো বাড়ীগুলা খাঁ খাঁ করিতেছে।

দূরে মনে হইল, গণেশ পাঁড়ের দরজা হইতে দুইটি লোক বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা গেল...

"বেটার আছে কি যে খাওয়াবে?"

চাঁদের আলোয় তাহাদের চিনিতে পারিয়া নবীন একবার চমকিয়া উঠিল...রাখহরি ও হরেকিষ্ট।

নবীনকে দেখিতে পাইবামাত্র হরিপদ কামারের গোয়াল-ঘরের পাশে গা-ঢাকা দিয়া দুজনেই সরিয়া পড়িল।

নবীন সেইখান হইতেই ফিরিল। রঙ্কিণীর মন্দির পর্য্যন্ত তাহার আর যাওয়া হইল না। মাথার ভিতরটা কেমন যেন বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

ইস্কুলের বিদেশী-পণ্ডিতটি পূজার ছুটিতে বাড়ী গিয়াছেন। তাঁহারই সেই পরিত্যক্ত ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ার টানিয়া আনিয়া নবীন চুপ করিয়া বসিল।

খোলা জানালার পথে ঘরের ভিতর চমৎকার জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে।

দূরের বাউরী-পাড়ায় মাদল বাজাইয়া গান চলিতেছিল। হরি কোব্‌রেজের ঘর হইতে হামান্‌দিস্তায় পান-ছেঁচার শব্দ আসিতেছে। পাশেই হিমি-বুড়ীর উঠানে প্রকাণ্ড একটা বাঁশের মাথায় ছোট একটা আকাশ-প্রদীপ ঝুলিতেছে।

নবীন এই প্রদীপটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। চোখ দুইটা তাহার বন্ধ হইয়া আসিতেছে। মাথার ভিতরটা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছিল।

...মনে হইল, প্রদীপটা যেন দপ করিয়া জলিয়া উঠিল। বাহিরে বাঁশের বাঁকারি ও রঙিন কাগজের আবরণটা পুড়িয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের মাথাটাও জলিতেছে।

নবীন সেদিক হইতে মুখ ফিরাইল।

সুমুখে একটা বই-এর আলমারি। তাহার মাথার উপর রঙিন একটা গোলাকার 'গ্লোব্'।

এই গ্লোবখানি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া স্কুলের ছেলেদের সে অনেকবার বুঝাইয়াছে—আমেরিকা...ইয়োরোপ ...এসিয়া...

তাহাদের এই ছোট গ্রামখানি নবীন মনে-মনে খুঁজিতে লাগিল। মনে হইল, গ্লোবটা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। সমস্ত দেশ, মহাদেশ, গ্রাম, নগর—মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেল...

আকাশ-প্রদীপের আগুন না জানি কখন আসিয়া বই-এর আলমারিতে লাগিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই আগুন গ্লোবে গিয়া লাগিল।

...গ্লোব পুড়িতেছে...।

নবীন আর সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সুমুখের টেবিলের উপর মাথাটা তাহার এলাইয়া পড়িল।

...পুড়ুক্! আর-একটা নূতন গ্লোব আনিয়া দিব।

শেষ

প্রেম ও ফুল

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

(দ্বিতীয় খণ্ড)

১

গ্রামের পথে চৈত্র-শেষের ভোরে
ফির্‌ছি আবার আগুন-খেলার' পর,
চাঁপাগাছটি আগেই গেছে মরে'—
ভেঙ্গে গেছে ফুলের খেলাঘর!

তেমন্ করে' প্রাণ কি আজও নাচে?—
মনের কথা থাক্ না মনেই চাপা,
সন্ন্যাসীদের গান সে আজও আছে,
গাছের ডালে নেই সে সোনার চাঁপা।

দশটি বছর সে এক দুঃস্বপন!—
গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে প'ল সাথী,
আমার শুধুই অকাল-জাগরণ,
পোহায় না যে দীর্ঘ অমারাতি।

* * *

চাইলে পরেই যায় যে-জিনিষ পাওয়া—
বিকায় সে ত' বেচা-কেনার হাটে,
সমাজ মেটায় যে সব দাবী-দাওয়া,
সে যে শুধুই দেহের বেলায় খাটে!

বড় যা'—তা' পাওয়ার অধিকার
এ জগতে নাইরে কারো নাই!
পাওয়া ত' নয়, দেওয়ার অহঙ্কার
রাখে যে জন—তারি যে জিৎ, ভাই!

জীবনে ওই একটা সাধন আছে—
নয় যা ফাঁকি, গিল্‌টী, ঝুটা, নকল;
পাওয়া হারে দেওয়ার সুখের কাছে—
একটু সে নয়—দিতে হ'বে সকল।

কিসের দাবী, দুঃখ কিসের ভাবি—
ভালই যদি বেসেছিলাম তারে?
থাক্‌ত যদি ভালবাসার চাবি,
ভাঙ্গতে হ'ত বন্ধ কবাটটারে?

কেবল সোহাগ অভিমানের পালা,
কাঙালপনা সেই যে নিরন্তর—
তার মাঝে কেউ আপন প্রাণের জ্বালা
জুড়াতে পায় একটু অবসর?

হাত পেতে যে সদাই থাকে বসে'—
নিজের ক্ষুধায় অন্ধ হ'য়েই আছে,
পিপাসা যার কণ্ঠ-তালু শোষে,
কি চায় নারী তেমন নরের কাছে?

বুকের তাপে শুকায় নয়ন-বারি,
গোপন শ্বাসে আগুন যে তার বাড়ে,
দগ্ধ প্রাণের ভস্ম অপসারি'
নিবায় কে সেই ঘুমন্ত অঙ্গারে?

* * *

মনে পড়ে, সে এক শ্রাবণ-দিনে
তিস্তা-নদী হ'তেছিলাম পার,
সে কি ভীষণ!—কে তায় তখন চিনে!—
একূল-ওকূল ঝাপ্‌সা একাকার!

নৌকা হ'ল হঠাৎ বেসামাল,
চেঁচিয়ে উঠে মাল্লা-মাঝির দল,
কেউ বা কাঁদে, কেউ বা পাড়ে গাল—
একটি প্রাণী—স্থির সে অচঞ্চল।

সে মুখ আমার পড়্‌ছে আজও মনে—
ঠোঁটের পাশে তেমনি হাসির রেখা,
ভয় যেন নেই কোথাও মনের কোণে,
চোখের তলে নেই যে কিছুই লেখা!

পরের মায়া, প্রাণের মায়া—কিছুই
নেই বুঝি তার, ভেবেছিলাম সেদিন;
হায় রে মানুষ! আপন পিছু-পিছুই
ছুটিস্ বলে' এমন নয়নবিহীন!

সেবার সবাই বেঁচে গেলাম খুবই,
এখন বুঝি গেলেই ভাল হ'ত;
বিপদ সে নয়—দুখের ভরা-ডুবি,
—বেঁচে যেতাম চিরদিনের মত।

* * *

দেশে এসে অনেকদিনের পর
ঘুরে বেড়াই চৈত্র-শেষের ভোরে,
ভেঙ্গে গেছে ষষ্ঠীতলার ঘর,
চাঁপা, সে ত' আগেই গেছে মরে'।

২

কেমন করে' মিট্‌ল সকল ধাঁধা,
ফুরিয়ে গেল সুখের অভিনয়,
ঘুচ্‌ল বাঁধন, মিথ্যা সাধন সাধা—
সে কথা যে মোটেই বেশী নয়।

*　　*　　*

চাকরী করি—দেশে দেশান্তরে
ঘুরে ঘুরে বেঁধে বেড়াই ঘর,
কখনো সে বিরাট তেপান্তরে,
কখনো বা ভাঙ্গন-ধরা চর।

দুইটি প্রাণী—নাই ক' ছাড়াছাড়ি,
ছেড়ে আমায় থাক্‌বে না সে কভু,
কোথাও নয়, হোক্ না মায়ের বাড়ী—
নিতে এলেও চায় না যেতে তবু।

যত্ন-সেবার একটু বিরাম নেই,
ভাব্‌না—কিসে থাক্‌ব আমি সুখে,
যে দেখে তায়, অবাক যে হয় সেই—
প্রশংসা না ধরে সবার মুখে।

রোগ যদি হয়, দিনে রাতে সমান
রইবে জেগে স্বামীর শিয়রটিতে,
অনাহারেও মুখখানি অম্লান,
ঘুমের পরশ্ নেই সে চাহনিতে।

*　　*　　*

এমনি করেই কাট্‌তেছিল দিন,—
সেবার যেন হঠাৎ কেমন করে'
দুই দিনে তার গণ্ড হ'ল ক্ষীণ,
চোখের পাতায় ঘুম যে আসে ভরে'।

জানি যে তার দুঃখ কিছুই নাই,
—বজ্র সমান কঠিন মনের তল,
প্রাণের ব্যথার নেই যে কোনোই ঠাঁই—
বৃথাই যে তার চোখের জলের ছল!

"হঠাৎ কিসের অসুখ হ'ল, রানি?"—
—জিজ্ঞাসিলে মুখ সে কঠিন করে,
কয় না কথা—হাত দিয়ে হাতখানি
ধরলে, যেন চোখে আগুন ঝরে।

অবাক হ'য়ে মুখের পানে চাই—
ভাবি, একি! এ-রূপ কোথায় পেলে!
ছবির মুখে হাসি যে আর নাই!
এ কোন্ প্রাণী উঠ্‌ছে পাথর ঠেলে!

দু'দিন যেতেই মূর্চ্ছা হ'ল সুরু,
সদাই চোখের চাউনি কেমনতর,
বুকের ভিতর সদাই দুরুদুরু,
কেমন যেন ভয়ে জড়সড়!

সেদিন দেখি, সন্ধ্যেবেলায় ঘরে—
বাক্স খোলা, নিজে লুটায় পাশে,
চোখের তারায় পলক নাহি পড়ে,
—আধেক-ঢাকা খোলা-চুলের রাশে।

হাতের মুঠায় একখানি কার চিঠি,
মেঝের উপর খোলা আর একখানি—
সদ্যলেখা লাইন দু'চারিটি!
কার সে লেখা? দেখে অবাক মানি।

লিখ্‌তে জানে পড়তে জানে সে যে—
তার ত' কোনো পাইনি পরিচয়,
এতদিন সে ছিল অবুঝ সেজে'!—
কেনই বা ?—এ আরেক যে বিস্ময়!

চিঠির বালাই ছিল না তার মোটে,—
কে বা লেখে, কেই বা জবাব ছায়?
বিদেশে তার বন্ধু যদি জোটে,
চোখের আড়াল হ'লেই ভুলে' যায়।

মায়ের খবর দিতাম নিজেই তারে,—
বাপ মরেছে, বাপের ভিটে ছাড়ি'
মা-ভাই এখন মামারি সংসারে,
আমার গ্রামেই তার যে মামার বাড়ী।

চিঠি দু'খান সরিয়ে তুলে রেখে
মাথাটি তার নিলাম কোলের 'পর।
একটু জ্ঞান হয়, আবার যে যায় বেঁকে—
এমনি করে' কাট্‌ল চার প্রহর।

সকাল বেলায় সকল কথা শুনে'
কহেন ডেকে প্রবীণ চিকিৎসক—
"কঠিন ব্যাধি রুদ্ধ মনাগুনে
চরম যে আজ, দেখ্‌ছি মারাত্মক!

"চিঠি দু'খান দেখ্‌তে হবে আগে—
এখনকার এই রোগের নিদান তাই!
পড়তে যদি তোমার ব্যথা লাগে,
তবে না হয় আমায় দিও, ভাই।"

দু'খান চিঠি নিজেই একে একে
পড়ে' গেলাম স্বপন-দেখার মত,
আমার সে মুখ কেবা তখন ছাখে—
চিঠির মালিক আছেন মূর্চ্ছাহত।

* * *

"দিয়েছিলে একটি অধিকার
চিরবিদায় ক্ষণে—
মাথায় নিয়ে আমার গলার হার,
একটি সে চুম্বনে।

"করিয়ে নিলে পণ সে দারুণ অতি—
জন্মে না দিই দেখা,
একটি চিঠির পেলাম অনুমতি
—মরণ-সময় লেখা!

"এবার তোমার স্বামী-সুখের মাঝে
ঘুচ্‌ল দুঃস্বপন,
নারি, তোমার একটু ব্যথা বাজে?
—হায় কি কঠিন পণ!

"ঝাপ্‌সা হ'য়েও মিলায় না এই চোখে
তোমার চেলির ছায়া!
মাপ যেন পাই ইহ-পরলোকে,
ওগো পরের জায়া!"

* * *

"মাপ যে খোঁজে ভালবাসার পাপে
মুক্তি কি তার হাতে হাতেই হয়?
মুক্ত তুমি?—কাহার অভিশাপে
নারীই শুধু পাপের বোঝা বয়?

"স্বর্গ আমার সাজিয়ে আছি বসে'—
 সে সুখ দেখে নরক মানে হার!
মাপ চেয়েছ মনেরি আপশোষে—
 অর্থ যে তার বুঝ্ছি পরিষ্কার।

"তাই হ'বে গো!—করছি তোমায় মাপ,—
 তুমি পুরুষ, আমি যে ভাই নারী!—
একা আমার সইবে সবার পাপ,
 হ'বে না সে একটু বেশি ভারী!"

আঁধারেই ফুটি' আঁধারে যে ফুল ঝরে,
 মুকুলে তাহার বিষ না সে পরিমল?
তারা মিটি-মিটি হাসে যে নীলাম্বরে—
 তারা জানে তার পীরিতির কিবা ফল।

জীবন-যামিনী একা জাগে বনবালা,
 অরুণ আলোর পরশে মরণ তার,
ভরি' ওঠে বুকে গোপনে মধুর জ্বালা,
 অসাড় পরাগে আঁধারের হাহাকার!

পাপ্ড়ি যে লাল!—বুঝি বা চেলাঞ্চল!
 একি বধূবেশ?—হায় হায় অভাগিনী!
মরম-শোণিতে রাঙা হ'ল হৃদি-তল—
 নিশার শাসনে কে ল'বে তোমারে চিনি'?

৩

তিনটি দিনের পর
 সংজ্ঞা এল ফিরে,
তখনও খুব জ্বর—
 মুখ্টি ফেরায় ধীরে।

আমার পানে চেয়ে
 সে কি চোখের জল
গাল দু'খানি বেয়ে
 ঝর্ল অবিরল!

বাতাস করি শুধু,
 মাথায় বুলাই হাত।
প্রাণের ভিতর ধূ ধূ—
 বাইরে আঁধার রাত।

* * *

মুখটা যতই ফেরাই,
 ততই সে তাই খোঁজে,
চোখ যদি না সরাই
 —চক্ষু নাহি বোজে।

চাউনি সে কি সরল
—সদ্য ফোটা ফুল,
আহা! যেন সজল
কমল সমতুল।

এতকালের চেনা—
সে মুখ এ ত' নয়!
চুকিয়ে সকল দেনা
—এ কোন্ পরিচয়?

হাসির মুখোস-পরা
কোথায় বা সেই নারী?
পড়ল আবার ধরা
কিশোর-বয়স তারি?—

আবার আঁচলখানি
উড়িয়ে আপন মতে,
বেড়ায় অসাবধানী
বকুলবনের পথে?

গামছা চাপি' দাঁতে
দিচ্ছে বুঝি সাঁতার,
সন্ধ্যা দুপুর প্রাতে,
দীঘির অথই পাথার?

পুতুল-বিয়ের তরে
গাঁথ্ছে পুঁতির মালা?—
বয়ের টোপর করে,
ক'নের বাজু-বালা।

বুকের সে বিষ আজও
জমতে আছে দেরী,
নেই কোন' ভয় লাজও—
মূর্ত্তি আনন্দেরি!

চোখের পানে চেয়ে
তাই ত' মনে হয়,
সে যেন কার মেয়ে!—
বধূ সে নয় নয়।

বিকালবেলায় দেখে
আবার পেলাম ভয়,
কানের কাছের ডেকে
দেখি চেতন নয়!

কর্ণ যেন বধির,
নীরব সে নির্ব্বাক,
চক্ষু দুটিই অথির,
—অধর ঈষৎ ফাঁক।

আবার পাগল-পারা
নামটি ধরে' ডাকি—
একটু ঠোঁটের সাড়া,
থির হ'ল সে আঁখি!

———

৪

নিয়ে গেলাম গৌরী-নদীর ঘাটে,
তখন জ্যোৎস্না-রাতি—
পঞ্চমী-চাঁদ পড়ছে হেলে' মাঠে,
অল্প ক'জন সাথী।

পেতে দিলাম বিজন বাসর তার
বালুর শয্যাতলে,
আধেক আলো, আধেক অন্ধকার
মিলায় নদীর জলে।

বিয়ের চেলি, সিঁদূর অনেকখানি
পরিয়ে এনেছিনু,
আল্‌তা যে খুব চওড়া করে' টানি'
দু'পায় দিয়েছিনু।

ভেবেছিলাম সতীর সজ্জা যত
—দেহের বাকি বালাই—
শ্মশান-শিখায় আজ্‌কে মনের মত
ভালো করেই জ্বালাই।

হঠাৎ এখন চেয়ে মুখের পানে
মনটা কেমন হ'ল,
বক্ষ আমার দারুণ ব্যথায় হানে—
ভুল যে ধরা প'ল।

কি করেছি! মড়ার উপর একি—
এ যে খাঁড়ার ঘা!
শেষ-আগুনে শোবার আগেও দেখি
তেম্‌নি জ্বলে গা'!

তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলাম তুলে'
নদীর কিনারায়,
অঞ্জলি-জল দিলাম সিঁথির মূলে—
সিঁদূর ধুয়ে যায়।

পড়ল খুলে' বিপুল খোঁপার রাশি—
বিউনি বুকের 'পর,
ঠোঁটের কোণে ফুট্‌ল যেন হাসি—
মরে'ও কি সুন্দর!

ওপারে ওই ঘন বনের আড়ে
চাঁদ যে ডোবে ডোবে,
এই আঁধারে চোখের নেশা বাড়ে
হায়রে কিসের লোভে!

আজ্‌কে আবার তেমনি কালো চুলে
কপালে সেই ছায়া,
নিশার আঁধার—মরণ-আঁধার কূলে
একি রূপের মায়া!

মরেও তবু ছাড়্‌বি না কি ছলা?
—এখনও হাতছানি?
বোকার বুকে বিঁধিয়ে রূপের ফলা
একি রে শয়তানী!......

একটি চুমা দিব কি ওই মুখে?
—আমি যে ভাই নিলাজ!
অনেক দুঃখ দিয়েছি তোর বুকে,
সইবে এটাও—দি' আজ?

যত্নে যেন শিশুর দেহের ভার—
বুকে নিলাম তুলে' ;
শুইয়ে চিতায়—তখন অন্ধকার—
চেলি দিলাম খুলে'।

জ্বল্‌ল আগুন ধোঁয়ায় আকাশ ভরি',
বাতাস উতরোল,
বালির উপর দিলাম গড়াগড়ি,
—উচ্চে 'হরিবোল'!

৫

আমার ভাগ্যে ফুল যে হ'ল বাজ—
বল, কিসের পাপে ?
ফাঁকি ছিল আমার হৃদয়-মাঝ ?
—বিধির অভিশাপে ?

ধুইয়ে গেল আঁখিজলের ধারে
আমার সকল গ্লানি,
ভরে' নিলাম শূন্য হৃদয়টারে
চিতার ভস্ম আনি'।

জানি না সে ; জেনেই বা কি হয় ?
ফিরবে কি আর জীবন ?
ভুল কি ঘোচে ? মর্ম্মে গাঁথা রয়—
ভুলেই ভরা ভুবন।

সারা জীবন হারিয়ে বেড়াই যদি—
পাইনি কভু তারে ?
পাওয়া সে নয় ?—ধেয়ান নিরবধি
মধুর হাহাকারে !

সেই ভুলেরই ব্যথার ফুলবনে
কাট্‌ল আমার রাতি,
পাইনি যাহা অশান্ত যৌবনে—
স্বপনে আজ গাঁথি।

আঁধার রাতে একলা যখন জাগি,
দাঁড়ায় দুয়ার পাশে—
বলি, "ওগো, এখনও কার লাগি'
ঠোঁট দু'খানি হাসে ?

নেই কে বলে ?—অসীম অন্ধকারে
গন্ধ যে তার পাই !
দহন-শেষে সুদূর গহন-পারে
তারার ভাতি নাই ?

"ঘুচ্‌ল নাকি এত ক'রেও তবু
কান্না-পাওয়ার ভয় ?
চিতায় পুড়েও এয়োর জ্বালা কভু
জুড়িয়ে যাবার নয় !

এখন বুঝি, এই ত' আমার ভালো,
—হারাই নি ত' তা'রে !
পায় নি সে-ই, শূন্য হাতেই গ্যালো,
পেয়েও পেলে না রে !

"ভয় কি, সখি ? মাথার কাপড় খুলে'
দেখই না একবার—
সিঁদুর সে আর নেই যে সিঁথির মূলে,
সব যে পরিষ্কার !"

যেমন বলা, অম্‌নি দু'চোখ তুলে'
চাইলে—সে কি মধুর !
নিজেই হঠাৎ মাথার কাপড় খুলে'
দেখায় সিঁথির সিঁদুর !

সেই আলোকে চিনে নিলাম বধূ
বসন্তশেষ প্রাতে,
যেমন সে হোক্‌—ফুরায় নি ত' মধু
সারা জীবনটাতে !

মিলায় ছায়া, মায়া ঘনায় মনে,
বুঝি বা না বুঝি—
কাটাই রাতি স্বপন-জাগরণে,
আবেশে চোখ বুজি'।

জীবনে নয়, মরণ হ'তেই তার
সেই যে পরিচয়—
পরম সে যে ! সকল অহঙ্কার
তাইতে হ'ল ক্ষয়।

* * *

অনেক দেখা অনেক দুখের শেষে
বুঝেছি এই সার—
মিথ্যা যে হয় সত্য—ভালবেসে !
—প্রেম যে চমৎকার !

তার পরে এই বছর পরে বছর
আমার চাঁপা-গাছে
ফুরায় নি ফুল,—অরূপ-রূপের নিঝর
আলো করেই আছে।

যৌবনেতে ছিল মধুর মোহ
বেসেছিলাম ভালো,
ছিল তখন প্রাণের সমারোহ,
দু'চোখ-ভরা আলো।

সেই কিশোরীর জোড়া-ভুরুর নীচে
নীল সে নয়ন-তারা,
কোঁকড়া-কালো চুলের রাশি পিছে—
হয় নি কভু হারা।

তারই বুকের ব্যথার দেবতারে
নিত্য-পূজা করি,
ব্যথার ব্যথী হয়েই পেলাম তারে
জীবন-মরণ ভরি'।

কাননে কাননে ফুটে উঠে ফুল-হাসি —
সে কি সুমধুর রঙীন নেশারি ভুল ?
সৌরভে তার বাতাসে বিনায় ফাঁসি,
উছসিয়া ওঠে হৃদয়ের উপকূল !

ফুলের ব্যথা যে সন্ধ্যারি মেঘ-মায়া—
নিমেষে মিলায় রজনীর আঁধিয়ারে,
নদীজলে তার পড়েছিল যেই ছায়া—
স্বপনে কেন সে দেখা দেয় বারে বারে ?

প্রেম আর ফুল—দুয়েরি সে হাহাকার
অতি অপরূপ ছলনা যে ধরণীর !
মিথ্যাই যে রে জীবনের মণিহার—
এক দেখি তাই হাসি আর আঁখিনীর !

যৌবন-যজ্ঞের কবি

শ্রী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

যৌবন তার বহুদূরে সরিয়া গেছে।

সিন্ধুর মত প্রাণবান্ জীবন্ত, সিন্ধুর মতই চঞ্চল পাগল, সিন্ধুর মতই পিচ্ছিল সে যৌবন যেন ধরা না দিয়াই হাসিয়া পালাইয়াছে। সিন্ধু অনন্তকালবিহারী, কিন্তু যৌবন তা' নয়—তবু সিন্ধুর মত লুটাইতে লুটাইতে সে অগ্রসর হয়, বাহিরে সে উচ্ছল উদ্দাম, গর্ভে তার কত রত্ন!—নিরবয়ব আয়ত্তাতীত ক্ষুধিত সমুদ্রের স্মৃতির মত তার যৌবনের স্মৃতি আজ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে—তবু সে স্মৃতির মোহ আছে, আবেশ আছে।—

......যৌবনের অন্তরে অন্তরে যত দীপ্তির হিরণ্যশ্রী একে একে ফুটিয়াছিল তাহারই দেওয়া অঙ্গারে বুক কালো হইয়া আছে, আশার যত মুকুল দেখা দিয়াছিল তার একটিও ফোটে নাই।

সে আজ বিশ বছরের কথা—

বিশ বৎসরের স্মৃতির নিরবচ্ছিন্ন লোহিত রেখাটি দীর্ঘ একটি ক্ষতচিহ্নের মত তাহার বুকে অমর হইয়া আছে।...

এখন সে ভৃত্য।—

কিন্তু বিশ বৎসর পূর্ব্বে সে প্রভুত্ব না করিলেও আশার উত্তাপে তার জীবন পাখীটির মত হাল্কা ছিল।

বইয়ের দোকানে সে কাজ করে।—

বইয়ের অর্ডার আসিলে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া সে বই কিনিয়া আনে—এই তার কাজ। বিস্তৃত ব্যবসার সে অঙ্গ, তার বিশ্রাম নাই, কিন্তু বিশ্রামেরই তার একান্ত প্রয়োজন—

দেহ শীর্ণ কিন্তু হাড় ক'খানা যেন ওজনে শতগুণ ভারি হইয়া দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। যে পথ হ্রস্ব ছিল তাহা দীর্ঘ অফুরন্ত হইয়াছে। মাটি গুরুতর, শীত তীব্রতর, রৌদ্র খরতর, বর্ষা ঘনতর, ক্ষুধা তীক্ষ্ণতর!......তার বিশ্রামেরই একান্ত প্রয়োজন।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে নিজের এই ছবিটি তার বিশাল কল্পনারাজ্যের কোনো প্রান্তই আঁধার করিয়া একবার উকিও মারে নাই।......ভগবান তার মস্তিষ্কে শক্তি দিয়াছিলেন—সে অতুল শক্তির সে অপব্যবহার করে নাই। তার যৌবন-যজ্ঞ জগদ্ধাত্রীর রত্নখচিত সিংহাসনের মত অনবদ্য চমকপ্রদ, যৌবন-যজ্ঞের প্রতিছত্রে বহুভঙ্গিম অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম সম্পদ দেদীপ্যমান, তার প্রত্যেকটি কবিতা পূর্ণবিকশিত শতদলের মত রূপে নিরুপম, হোম-শিখার মত প্রদীপ্ত পবিত্র, যজ্ঞের মতই অর্থে ব্যাপক, শরতের আকাশের মত স্বচ্ছ সুপ্রসন্ন।

তবু যৌবন-যজ্ঞ অজ্ঞাত রহিয়া গেল......

যে জীবন্ত প্রবুদ্ধ প্রতিভা মানবের মানসী সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা একটি আঘাতেই ভাঙ্গিয়া শুকাইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গেল—ক্ষুধার আঁচে পুড়িয়া সেই অপরূপ রসের ভাণ্ডার হর-নেত্রের আগুনে দগ্ধ মদনের মত একেবারে শূন্যে মিলাইয়া গেল! সে নিঃশব্দ আর্ত্তনাদ পৃথিবীর কাহারও কানে গেল না!......

কবি আজ ম্লানচক্ষু, ন্যুব্জ; মানুষের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবার সাহস তার নাই।

তার প্রাণের সৃষ্টির সঙ্গে তার বুকের আশা আর দেহের রূপ নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন হইয়া ডুবিয়া গেছে।......

২

একদিন সকালবেলা তাহার জীবনে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল।

অর্ডারী পুস্তকের তালিকা লিখিয়া লইতে লইতে সে যেন শুনিল—৭নং। অনাদিনাথ দত্ত প্রণীত যৌবন-যজ্ঞ, কবিতাপুস্তক, এক কপি।

অনাদির বুকের ভিতর ধক্ করিয়া উঠিল, তার হাত কাঁপিতে লাগিল; মুখ তুলিয়া অনাদি বলিল,—আবার বলুন, ভাল শুন্‌তে পাইনি।

যিনি তালিকা লিখাইতেছিলেন তিনি বলিলেন,—আপনারই নামে নাম কে একজন অনাদিনাথ দত্ত যৌবন-যজ্ঞ কবিতার বই লিখেছিলেন, তারই এক কপি।

একজন কর্ম্মচারী বলিল,—দত্ত মশায়, আপনি নন ত? অনাদি অস্ফুটস্বরে বলিল,—আমি-ই।

স্পষ্ট কেহ হাসিল না, কিন্তু হাসি যে জমিয়া উঠিয়াছে তাহাও অনাদির অগোচর রহিল না।

প্রধান যিনি তিনি যেন চম্‌কিয়া উঠিলেন, বলিলেন, বল কি, তুমি?—বলিয়া তিনি চশমার ভিতর হইতে বড় বড় চোখে অনাদির আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিলেন, এবং মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন,—সমগ্র যৌবন-যজ্ঞ দূরের কথা তার মুৎভাণ্ডটি রচনা করাও তোমার সাধ্য নয়।

অনাদি তাঁর অবিশ্বাসটা লক্ষ্য করিল—

কিন্তু অতীত তখন তার সমস্ত রূপরসগন্ধের প্রোজ্জল সমারোহ লইয়া পুষ্পিত মালঞ্চের মত তার ধ্যানের সম্মুখে সাজিয়া উঠিয়াছে।......

কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য!

অনাদি ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল,—কার অর্ডার?—বর্দ্ধমানের কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়ের।

অনাদি কলের মত নিষ্প্রাণ প্রাণে তালিকা সমাপ্ত করিল, এবং যখন সে নিত্যকার মত অর্ডারী বই খুঁজিতে বাহির হইয়া গেল, তখন তার চরম নিরাশ্বাস লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে ইন্দ্রজালের ইন্দ্রালয় সহসা পলকের তরে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে আরো নির্জ্জীব করিয়া রাখিয়া গেছে।......সেদিন বহুদিন পূর্ব্বেই ভস্মে ঢাকা শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে যেদিন এমনিধারা খান-কতক চিঠি আসিলেই তাহার জীবনের কল্লোলিত ধারা কোন্ পথে বহিয়া এখন কিরূপ লইয়া কোথায় যাইয়া পৌঁছিত তাহা আজ অনুমান করা শক্ত হইলেও ইহা ঠিকই যে মরুভূমির অগ্নি-নিঃশাসে অকালে সে শুকাইয়া উঠিত না!

কর্ত্তব্য সম্পাদনের যে আগ্রহ লইয়া সে প্রত্যহ কাজে

বাহির হয় তাহা যেন সহসা আজ নিতান্তই পুরাতন নীরস বিস্বাদ হইয়া বার্দ্ধক্যের গুরুভারে একেবারে শ্লথ হইয়া গেছে। পাদুখানা টানিয়া টানিয়া নিতান্তই উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ পরিচিত একজন পুস্তক বিক্রেতার ডাকে তাহার হুঁস হইল।—তারপর সারাদিন দোকানে দোকানে ঘুরিয়াও যৌবন-যজ্ঞের সন্ধান হইল না—

নূতন কি পুরাতন কোনো পুস্তকালয়ে যৌবন-যজ্ঞ নাই। নিজে তন্ন তন্ন পাঁতি পাঁতি করিয়া বইয়ের আলমারী বাণ্ডিল গাদা খুঁজিয়া খুঁজিয়া নাকে-মুখে ধূলা ঢুকিয়া অনাদি সারা হইল—

যৌবন-যজ্ঞ পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় দিনেও মিলিল না। যৌবন-যজ্ঞ পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেছে!

তৃতীয় দিনে অতিশয় পুরাতন একটা পুরাতন পুস্তকালয়ে তার এক কপি পাওয়া গেল—কিন্তু তার মলাট নাই। তা না থাক বই ত পাওয়া গেছে।

ধূলিমলিন বইখানি হাতে করিয়া অনাদির হাত কাঁপিতে লাগিল; নিস্পলক চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া অনাদির চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

তখনকার দিনের সেই নিবিড় মধুরতা আর নিঃশঙ্ক স্বপ্নের মাঝে তাহার মন একবার ডুব দিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই এই আলোড়নে তাঁহার অনাদিকালের শুষ্ক মুখ সেই ব্যথাটা পুনরুজ্জীবিত রক্তাক্ত হইয়া তাহাকে যেন সংজ্ঞাহীন করিয়া দিতে চাহিল।

৩

বর্দ্ধমানের কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়কে বই পাঠানো হইল।—

অনাদি সঙ্কল্প করিল সে বর্দ্ধমান যাইবে। এই লোকটিকে তার দেখা চাই। তাহার লাঞ্ছিত পরিত্যক্ত প্রাণের বস্তুটিকে তার যৌবনের আশার মূর্ত্তিটিকে যে ব্যক্তি সন্ধান করিয়া কাছে লইয়া আদর করিতেছে তাহাকে একবার দেখা চাই-ই......

তাহাকে সে ভালবাসে।

রবিবারে দশটার গাড়ীতে অনাদি বাহির হইয়া পড়িল। যে পোষাকে সে পথে দোকানে দোকানে বইয়ের সন্ধানে বেড়ায় আজ সে পোষাক অনাদি ছাড়িয়া আসিয়াছে।

অনাদি বুঝিল, বর্দ্ধমানের কমলাক্ষ একজন কবি, গুণগ্রাহী, রসজ্ঞ—

কেহ হয় তো যৌবন-যজ্ঞের কথা তাহাকে বলিয়াছে, বা দু' একটি ছত্র পড়িয়া শুনাইয়াছে, রসিক কবি মুগ্ধ হইয়া গেছে।—ভাবিতেই অনাদির দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আজ নিজেকে তার কিছুতেই ছোট মনে হইল না; আজ সে দুনিয়ায় যে কোনো পুরুষের সমকক্ষ! হইলই বা সে নির্ধন......

তাহার অন্তরের মহাধন একদিন সে এই বিশ্বের সম্মুখে ঢালিয়া দিয়াছিল; অন্ধ বিশ্বের সেদিন তা চোখে পড়ে নাই, আজ এতদিন পরে বিশ্বের চোখ ফুটিয়াছে—মহার্ঘ্য রত্নহার সে কুড়াইয়া লইয়া কণ্ঠে পরিতে হাত তুলিয়াছে!

আজ সে দরিদ্র আপন হীনতায় লজ্জিত ভৃত্য নহে; আজ সে কবি, মানব অন্তরের অন্তঃপুরবাসী রাজর্ষি সে।

সে কবির সহিত কাব্যালোচনা করিতে চলিয়াছে।

কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাণ্ড বাড়ী—

দেখিয়াই অনাদি পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, এটা যেন ঠিক কাব্যালোচনার স্থান নয়; তাহার আরও মনে হইল, ইহার ভিতর যেই থাক, কাব্যালোচনার যত অবসরই তার থাক্‌, শুদ্ধমাত্র যৌবন-যজ্ঞের কবি তার সমকক্ষ কিছুতেই নয়।

ভিতরে সংবাদ গেল, এবং ফেরত সংবাদ আসিল, বাবু দেখা করিতে পারেন।

অনাদি কম্পিতবক্ষে বাবুর কক্ষে প্রবেশ করিল। কমলাক্ষ কবি হউন, রসজ্ঞ হউন, তাহার বিচার পরে হইবে কিন্তু আপাততঃ তিনি ধনী বটে! যে জিনিষটার উপর অনাদির চোখ পড়িল সেইটাই দামী, অল্পমূল্যের কোনো সামগ্রী সেখানে নাই।

টেবিলের উপর যথেচ্ছা কাগজ-পত্র ছড়ান রহিয়াছে; তাহারই একখানার উপর হইতে মুখ তুলিয়া কমলাক্ষ অনাদির প্রতি নেত্রপাত করিলেন,কিন্তু আগন্তুককে বসিতে আহ্বান করিলেন না।—আগ্ বাড়াইয়া আত্মপরিচয় দেওয়াই অনাদি এ-ক্ষেত্রে সঙ্গত মনে করিল। নমস্কার করিয়া বলিল,—আমার নাম শ্রীঅনাদিনাথ দত্ত।

অনাদি আশা করিয়াছিল, যৌবন-যজ্ঞ-প্রণেতার নাম শুনিয়াই বাবু চিনিয়া ফেলিবেন; কিন্তু, কমলাক্ষ যেন বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—তা' বেশ, কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে বলে' ত' আমার মনে হয় না!

অনাদির সমস্ত অভ্যন্তরটা যেন মুচ্ড়াইয়া উঠিল। বলিল,—আপ্নি সম্প্রতি একখানা কাব্যগ্রন্থ কিনেছেন, যৌবন-যজ্ঞ; আমি—

কমলাক্ষ বলিলেন,—তা' অসম্ভব নয়; আমার লাইব্রেরিয়ান অর্ডার দিয়ে থাকবে। যৌবন-যজ্ঞ বুঝি কবিতার বই? তা' কি হ'য়েছে?

অনাদির আশার মন্দির সমূলে ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু ভাঙ্গনের আঘাতে তার চোখে জল আসিল না—এই নির্ব্বোধ অজ্ঞ সৌখীন সংসারের বিরুদ্ধে বিশ বৎসরের সঞ্চিত সমস্ত বিদ্বেষ তার অকস্মাৎ ফেনিল হইয়া জলিয়া উঠিল।......

আত্মবিস্মৃতির সীমাস্পর্শ করিয়া সে যেন টলিতে লাগিল।......

তবু প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়া থাকিয়া অনাদি বলিল,—আপ্নি বুঝি কবিতার বই শুধু সংগ্রহ করেন?

কমলাক্ষ বলিলেন,—তা' করে' থাকি। আপ্নার বুঝি বইয়ের দোকান আছে? এখন আম্রা ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্ত্তী যুগের গীতি কবিতা সংগ্রহ কর্ছি। আপ্নাদের মূল্য তালিকা একখানা পাঠিয়ে দেবেন। আর কোনো কাজ আছে?

—আজ্ঞে না।

অনাদি নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

কমলাক্ষ ভাবিতে লাগিলেন, অদ্ভুত লোক! ফেল্-পড়-পড় বইওয়ালা, গন্ধ পেয়েই ছুটে এসেছে! *

---

* G. G.

নটরাজ

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্ শুনিস্ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !

বৎসহারা কোন্ সাহারা হাহা করে, কোথায় হাহা করে,
কোন্ সাগরে ঝড় উঠেছে, মেঘ-গরুড়ে আকাশ আড়াল করে ;
আবার কোথায় অন্‌কি ওড়ে বদ্ধ নালার জলে,
চড়ুই ছুটি বাঁধ্‌ছে বাসা কড়িকাঠের তলে !

বিসুবিয়াস্-বিষ খেয়ে কে উগ্‌রে তোলে আগুন উগ্‌রে তোলে,
গ্রহ তারার ঘূর্ণিপাকে মাথা ঘুরে উল্কা পড়ে টলে' ;
আবার কোথায় মাকড়শাতে বুন্‌ছে বসে জাল,
মহুয়া-বন মাৎ করে ওই মৌমাছিদের পাল !

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্ শুনিস্ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !

পুচ্ছ-বাঁধা অনল-জ্বালায় ধূমকেতু কে ছট্‌ফটিয়ে ছোটে,
প্রসবব্যথায় কাঁদিয়ে নিশীথ আঁধার ফেটে নতুন তারা ফোটে ;
আবার কোথায় মৌটুসকি টুস্‌কি মারে ফুলে,
পের্‌জাপতি হলুদ ক্ষেতে বেড়ায় দুলে দুলে !

তেপান্তরে লাগ্‌ল আগুন—ছুব্‌লে আকাশ খুব্‌লে নিলে আঁখি,
সৃষ্টিখানার ঝুঁটি ধরে কোন্ সে দানো দিচ্ছে কোথা ঝাঁকি ;
আবার কোথায় রোদ উঁকি দেয় পাতার চিকের ফাঁকে,
কাঠ্‌বেড়ালির চমক্ লাগে বনশালিকের ডাকে !

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্ শুনিস্ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !

বাঁজা ডাঙায় লড়াই বাধে হাজার দাঁতে কামড়ে ছেঁড়ে টুঁটি,
লক্ষ খুনীর খুন চেপেছে, কবন্ধ ধড় খাচ্ছে লুটোপুটি ;
আবার কোথায় নিশীথ রাতে প্রদীপ মিটিমিটি,
রুদ্ধ-নিশাস পড়ছে বধূ প্রিয়তমের চিঠি।

বোল্ হাঙরের লাগল গাঁদি, জাহাজ ডোবে ডুবো-পাহাড় লেগে,
কোন্ দেশেতে লাগল মড়ক, ভাগাড় আঁধার শুক্‌নি-ঝাঁকের মেঘে ;
আবার কোথায় হাঁস চরে ওই শ্যাওলা-দীঘির ঘাটে
ঝিউড়ি মেয়ে ঘস্‌তেছে পা খেজুর-গুঁড়ির পাটে !

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্ শুনিস্ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !

তাতা থিয়া, তাতা থিয়া—ঠোকাঠুকি নীহারিকার মালায়,
তাতা থিয়া,—সিন্ধু নাচে বক্ষে জ্বালা বাড়বানল জ্বালায়,
তারি সাথে যুগে যুগে দোলে, দোলে, দোলে,
নটরাজের নাচন্ চির নারী-মাতার কোলে ।*

---

* আধুনা লুপ্ত 'সংহতি' হইতে

একটি কাহিনী

শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল

একটি ছোট্ট আত্মকাহিনী মনে পড়ে।—অনেক দিনের কথা।

বাড়ীর পাশে বাড়ী—আলাপ হওয়া আর বিচিত্র কি! তবু প্রথম আলাপের পরিচয়টা দিই—

বলিলাম, খুকী, তোমার চুল ত খুব কোঁকড়ানো?

মেয়েটা ঠোঁটকাটা। বলিল, ভাল দেখাচ্ছে বুঝি? বলিয়া চোখ পাকাইয়া চলিয়া গেল।

আর যায় কোথা! আশে পাশে ঢি ঢি পড়িয়া গেল। মেয়েটাই বলিয়া দিয়াছে। বড়দি বলিল, তুই হেসে হেসে চারুকে কি বলেছিস্ রে?

অবাক হইয়া গেলাম! দিদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া পুনরায় বলিল, ওর যে এখনও বারো উৎরোয়নি—দুর্গা—দুর্গা—বলিয়া চলিয়া গেল।

চারুর মা নাই। বাপটি গো-বেচারী, কেবল মৃদু মৃদু হাসিয়া কাজে চলিয়া যান। আমাদের বাড়ীতেই তার যত আব্দার।

ষোল বছর বয়স অবধি অমন বিপদে পড়ি নাই। সে বয়সে লেখাপড়া ভিন্ন আর কোনও অধিকার থাকিতে পারে না ইহাই সকলে জানে। সুতরাং বিদ্রূপ, মন্তব্য ও কটাক্ষে আমার বাড়ী টেঁকা দায় হইল।

একদিন রাগিয়া আগুন হইয়া বলিলাম, অমন বদনাম দিলে আত্মহত্যে করে ফেলব জান?

কিন্তু বদনামটার গুরুত্ব যে কি তাহা সেদিন ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আত্মহত্যাও করি নাই। তবে লাভের মধ্যে সকলে চুপ করিয়া গিয়াছিল। বাড়ীর এক ছেলে কিনা!

...ছাদে একদিন ঘুড়ি উড়াইতে উঠিয়াছি। চারুও তখন ছাদে। আমাকে শুনাইয়াই ও-ছাদ হইতে বলিল, কোঁকড়ানো চুল—তা কার কি?

আবার বলিল, বড্ড মাথা ব্যথা—ইঃ—

হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, আমায় বলছ বুঝি?

যেন শুনিতে পায় নাই—এমনি ভাবে সে পিছন ফিরিল। আমি একটু একটু হাসিতে লাগিলাম।—হাতের ঠিক ছিল না—ঘুড়িখানা গোঁত্তা খাইয়া—পড়্বিত পড়্—একেবারে চারুর মাথার উপর ঠক্ করিয়া পড়িল।

হঠাৎ অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। সে কট্মট্ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া দুম্‌দুম্ করিয়া চলিয়া গেল, মুখে কিছুই বলিল না, মনে হইল রাগিয়াছে।

আমিও চক্ষের নিমেষে ঘুড়ি লাটাই ফেলিয়া নীচে নিজের ঘরে বই লইয়া বসিয়া গেলাম। কিন্তু বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিলাম—সে কথা লইয়া কেহ কিছুই বলিল না। কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। তবে কি চারু বলে নাই!—হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সত্যই সে কাহাকেও কিছু বলে নাই। তাহার উপর আমার যে রাগটুকু হইয়াছিল—তাহা আর রহিল না।

আবার একদিন জানালায় দাঁড়াইয়া সে বলিল, এবার কিছু কল্লেই বলে দেবো—ওঃ বড্ড গম্ভীর হয়ে থাকা—কথা কওয়া হয় না!—না কইলে ত বয়ে গেল। বলিয়া চলিয়া গেল।

হাসি চাপিয়া থাকা যায় না—কিন্তু কথা কহিলাম না। সে পুনরায় আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, দাঁত বার ক'রে আবার হাসি হচ্ছে—

বলিলাম, হাস্‌লে কার না দাঁত বেরোয়?

আমার বেরোয় না—

ফুচ্‌কি হাসিয়া বলিলাম, তবে তুমি বুড়ি—

—কি আমি বুড়ি?—আবার যা' তা' বলা? বড়দি'কে বলে দিচ্ছি—

আমার ভয় হইল। বলিলাম, আচ্ছা—আচ্ছা বুড়ি নও—বুড়িদের অমন কোঁকড়ান চুল হয় কি? না চারুই তাদের নাম হয়?

সে এইবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। একটু সাহস পাইয়া বলিলাম, চারু নামটি বেশ,—

খুব হয়েছে—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

পরদিন দুপুর বেলায় বলিল, দুজনে তাস খেলা যায় না?

বলিলাম, আমি ত জানি না—

আমি শিখিয়ে দিতে পারি—কত লোককে শিখিয়েছি—সে বলিল।

কিন্তু আমি বেশ জানি সে একজনকেও শেখায় নাই। বলিলাম, ভয় করে তোমার সঙ্গে খেলতে—আবার কেউ কি মনে করবে—

বয়স অল্প হইলে কি হয়—মুখটি চারুর রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মুখ নীচু করিয়া বলিল, শুধুই ত তাস খেলব আর কিছু ত নয় এতে দোষ কি?

দোষ যে কি তাহা সে জানে না, কিন্তু আমি বুঝিতে শিখিয়াছি। বলিলাম, যদি সকলে আবার ঠাট্টা করে?

সে জলিয়া উঠিয়া বলিল, ঠাট্টা—ঠাট্টা কি করবে শুনি?—যাও, জানিনি—বলিয়া চলিয়া গেল।

তাহার ও রাগতভাব আমার ভারী ভাল লাগিল। মনে ভাবিলাম, ভাগ্যিস্ আত্মহত্যা করি নাই!

চারু রোজই একবার করিয়া এ বাড়ীতে আসে। আগেও আসিত, তবে এত ঘন ঘন নয়। বড়দি' রোজই তাহার চুল বাঁধিয়া দেয়। আমি ঘরের জানালা একটু ফাঁক করিয়া তাহাকে দেখি।

দিদি আঁচল দিয়া তাহার মুখখানি মুছাইয়া দেয়। মুখটি লাল হইয়া ওঠে।

মা বলেন, সুন্দর মেয়ে কিনা—মুখ দিয়ে ঠিক রক্ত ফেটে পড়ে। মেয়েটা কোনও বড়লোকের হাতে পড়বে—

দিদি বলে, এই চিরুণী খানা সতীশের ঘরে রেখে আয় ত চারু—এখানা ওরই—অমনি পাউডারের শিশিটা নিয়ে আসিস্—

চিরুণী খানা আমার টেবিলের ওপর রাখিয়া চারু বলে, জানলা দিয়ে উঁকি মারছিলে কেন? আমি বুঝি দেখ্‌তে পাইনি?

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলি, দেখলেই বা—তা কি?

বুড়ো ধাড়ি, জ্ঞান নেই—দাও, পাউডারের শিশি দাও—

হাসিয়া বলি, মুখে মাখবে বুঝি? এমনিই ত দেখতে ভাল—

তবে চাইনি যাও—আমি চললুম—

আমি খপ্ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলি, বলি, উঃ মেয়ের রাগ দেখ—

সে হাসিয়া হাত ছাড়াইয়া লয় এবং হাতের কাছে পাউডারের কৌটা লইয়া চলিয়া যায়।

প্রজাপতির পাখায় রং বুলায় কে—তাহার খবর কেই বা রাখে!—

বিজয়া দশমী। আমার উপর ভার পড়িল বাড়ীর ছেলে মেয়েদের ভাসান দেখিতে লইয়া যাইবার। ছেলে মেয়ের মধ্যে ত ওই দিদির পাঁচ বছরের ছেলে—পঞ্চু! দিদি বলিল, চারুকেও নে যাবি?—সাজিয়ে গুজিয়ে দিচ্ছি—

বলিলাম, ও যেতে চাচ্ছে বুঝি?

ও চাইবে কেন? আমিই বলছি। দিদি বলিল।

চারুও যাইতে রাজি—তবে আর কি! যাইবার সময় মা বলিয়া দিলেন, দেখিস্ সতে, পরের মেয়ে—।

চাঁদের আলো যে অত মধুর হয়—জীবনে সেদিন প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম।

ফিরিবার সময় চারু আমার হাত ধরিয়া সরু রাস্তাটা দিয়া চলিতেছিল। হঠাৎ হাতে একটু টিপ্ দিয়া বলিল, সতীশদা'—তুমি চলতে পাচ্ছ না বুঝি? পা ব্যথা কচ্ছে?

দূরের বাজনাও তখন থামিয়া গেছে। রাত অনেক। পঙ্গু মস্‌মস্‌ করিয়া বীরের মত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

আমি আস্তে আস্তে চারুর মাথার চুলের ভিতরে আঙ্গুল চালাইতে লাগিলাম। তাহার বোধ হয় ভালই লাগিল। বলিল, কথা কচ্ছনা যে সতীশদা'—আমার ওপর সেই থেকে রাগ আছে বুঝি?

তবুও চুপ করিয়া রহিলাম।

বুকের উপর হাত রাখিয়া আমায় কেউ পরীক্ষা করিলে বুঝিত, কৈশোরের সেটা প্রথম স্পন্দন—অস্থির দ্রুত!

চারু চলিতে চলিতে আবার বলিল, আমায় মাপ কর সতীশদা'—

হঠাৎ মনে হইল আমার ভিতরের নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে এক প্রচণ্ড বিদ্যুৎ রেখা জ্বলিয়া উঠিয়া সারাদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল!

তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, আমায় তুমি ভালবাস চারু?

চারু সুমুখের মাঠের ওধারে একবার চাহিল—আমার মুখের দিকে একবার চাহিল। তারপর আমার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, আমার ওপর রাগ করেছিলে?

কেমন হইয়া গেলাম! এবং আর কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া অনেকগুলি চুম্বন করিয়া ফেলিলাম।

ঐখানেই শেষ।

কতদিন চলিয়া যায়। সহরে থাকিয়া লেখা পড়া করি। কলেজে ভাল ছেলে বলিয়া সুখ্যাতি পাইয়াছি। কাকার ওখান থেকে টাকা আসে।

কতদিন যে গিয়াছে তাহার ঠিক রাখি নাই। বোধ হয় বছর পাঁচেক হইবে। দেশের বাড়ী ঘর বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—সেখানে আর যাই নাই।

চারুর বিবাহ হইয়া গেছে জানি। কিন্তু সে কোথায় আছে কেমন আছে তার কোনও খোঁজই রাখি নাই।

তবু দিন যায়। স্মৃতি ঝাপ্‌সা হইয়া গেছে।

দিদির জেদাজেদিতে বিবাহ করিয়াছি। কিন্তু চারুকে যে একদিন ভাল বাসিয়াছিলাম তাহা অস্বীকার করি নাই। তাহার ভালবাসা আজও আমার কাছে তেম্‌নি মধুর! কিন্তু অবস্থার ফেরে সে অন্যের আমি অপরের।

আমিই কি ছাই সে বয়স অবধি জানিতাম যে মানুষের পূর্ব্ব জীবনের চপলতা আবার কোথাও দাগ রাখিয়া যায়? এক একবার মনে হইত, এত বড় জীবনে ওরকম কত আসে যায়। কিন্তু সেটা যে কত বড় ভুল—তা পরে বুঝিয়াছি। ওদাগ একবারই পড়ে।

বিবাহের বহুদিন আগে দিদি একবার বলিয়াছিল, তুই নিশ্চয় চারুর কথা ভাবিস্—বলিয়া কাছে আসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া আবার বলিয়াছিল, সে যে এখন পরের হয়েছে—তার কথা কি ভাবে রে?—আমি খুব জোরে হাসিয়াছিলাম। সে হাসির অর্থ আমিও বুঝি নাই।

যাক্—সম্প্রতি ডাক্তারী পাশ করিয়া পসার জমিয়াছে। ছুটির বার। রোজই বন্ধুর বাড়ী তাসের আড্ডা জমে। আজও সেই উদ্দেশ্যে যাওয়া।

অমন রৌদ্রের তেজ বোধ হয় অনেকদিন দেখি নাই। রাস্তা দিয়া চলিয়াছি।

গাছতলায় ওটি যে স্ত্রীলোক তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তের মত মুখখানা সাদা—তার কোনও বর্ণই নাই। মাথায় চুল নাই—ঠিক যেন ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। চোখ দুইটা দেখিতেই পাওয়া যায় না। শকুনির মত গলাটা সরু—অনায়াসে নখে করিয়া ছিঁড়িয়া আনা যায়। যৌবনের ছোঁয়াচ কোনও দিনই তার দেহে লাগে নাই। কিম্বা কেহ নিঙড়াইয়া লইয়া শুধু কাঠখানা পথের ধারে ফেলিয়া দিয়াছে!—

আহা—

চলিয়া আসিতেছিলাম। সে যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া বলিল, শুনুন—

ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। একটা ঢোক গিলিয়া বলিলাম, কি বলনা—ওইখেন্ থেকেই—

তবে থাক্—বলিয়া সে আবার কি চিবাইতে লাগিল।

একটু দয়া হইল। নিকটে সরিয়া গিয়া বলিলাম, কিছু চাই?

আশ্চর্য্য সেই মুখ সেই চোখ! মাথা নীচু করিলে টানা চোখ দুইটা যে পাশ দিয়া দেখা যাইত—ইহারও তাই। তেমনি ভঙ্গী—সেই হাসি!

স্বপ্নাবিষ্টের মত মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তুমি চারু—?

সে হাসিয়া বলিল, আমায় চেনেন বুঝি? বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া আমার পকেটে একটা ঠোনা মারিয়া বলিল, কিছু আছে?—টাকা কি পয়সা?

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। বলিলাম, তোমার বাড়ী কোথায়—তোমার বাবার—?

সে বলিল, বাড়ী—জানিনি ত?—আচ্ছা মুড়ি টুড়ির দোকান আছে এখানে? দিন্‌না গোটা কত' পয়সা—

চুপ করিয়া রহিলাম। সে আবার বলিল, কিছু থাকে ত দিন না বাবু—ক'দিন খাইনি—বলিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে আমার পকেটের দিকে চাহিল।

এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলাম, কোথায় থাক' তুমি?

ওই যে ওই বাড়ীটায়—বলিয়া আঙুল বাড়াইয়া একখানা বাড়ী দেখাইয়া বলিল, ওখানে কি কিছু হবার যো আছে—ছুঁড়িরা মনে করে ওঁরাই কত সুন্দরী—যেই আসুক নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়—আমরা পেটে কিল মেরে থাকি—এই না?

হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এতক্ষণ যে একটা লজ্জাকর সন্দেহ বুকের ভিতরটায় ধক্ ধক্ করিয়া উঠিয়াছিল তাহা থামিয়া গেল। তাহা হইলে পাগল!

একটি সিকি সম্বল ছিল—ঠুন্ করিয়া তাহার কাছে ফেলিয়া দিলাম। চলিতে চলিতে শুনিলাম, সে বলিতেছে, মোটে চার আনা?—দেখতে ভাল হলে আর চার আনা দিত বোধ হয়—ওগো অ' বাবু শুনচ?—তোমার এ সিকিটা বোধ হয় তেলা—

আমি আর শুনিলাম না—কিন্তু খানিক দূর গিয়া একবার পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, সে হাসিতে হাসিতে সিকিটা বাজাইতেছে। তারপর সেটা আঁচলের খুঁটে গেরো দিয়া বাঁধিল। আবার খুলিল, খুলিয়া কোঁচড়ে রাখিল—কিন্তু সেখান হইতেও খুলিয়া নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

সমস্ত কোলাহলের মাঝে নিজের মধ্যে একবার ডুব দিয়া দেখি—সেখানে শুধু আমিই আছি—।

জল, মাটি, আকাশ—এসব হইতে সে বিভিন্ন। সে শুধু একা!

তবু মনে হয় সেখানে আর একটা কিছু আছে। মনের মধ্যে মাঝে মাঝে সে মাথা চাড়া দিয়া ওঠে।

সমস্ত দেনা-পাওনার মধ্যে মনে হয়—কোথায় কি একটা খোঁচ্ রহিয়া গেছে।

দুইটি চাহনি ক্রমে এক হইয়া মিলিয়া যায়। দুইটি হাসি দেখিতে দেখিতে একই ছবির মধ্যে ফুটিয়া ওঠে।

ঘরের একটা জানালা খুলিয়া দেখি—জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর ভারে নীল আকাশটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আর একটায় দেখি, পাণ্ডুর চাঁদের আলো—অবশ—শিথিল। যেন বার্দ্ধক্যের আর্ত্ত ম্লান হাসি!

ছেলেবেলা হইতে যাহাকে দেখিয়াছি,—হৃদয় দিয়া যাহাকে চিনিয়াছি—তাহাকে চিনিতে আজ এত সন্দেহ! ধিক!—পাঁচ বছরের অদেখায় যাহাকে তুমি ভুলিতে বসিয়াছ তার প্রণয়ী তুমি! এমন মিথ্যা প্রণয়ের নামে অমন করিয়া সেদিন মধুপান করিয়াছিলে কোন্ লজ্জায়!

কিন্তু এখনও ত আমি তেমনি অজ্ঞান। ক্ষুধার্ত্ত

মানবাত্মা যাহাকে নিষ্ফল হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইল—সেই বা কোথায়! যে আমার জীবনে আসিয়াছিল—সে চলিয়া গেছে—এই টুকুই জানি! কিন্তু আমারই বুকের ভিতর যে পথটি ধরিয়া সে চলিয়া গেছে তাহা ত কই নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল না!

এই বাড়ীটার কথাই না বলিয়াছিল?

পতিতাদের একটা খোঁয়াড়—এইখানে সে?—দূর্ দূর্—বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

তবে কোন্ বাড়ী?—সব গুলাতেই ত এম্‌নি নারীর মেলা—

খুঁজছ কাকে বাবা?

ফিরিয়া দেখিলাম একটা বৃদ্ধা। বলিলাম, একটা পাগ্‌লি থাকে এখানে—জান?

ওমা থাকে বৈকি—যাও বাবা—যাও। ওই দোতলার কোণের ঘরখানা—যাও ওই বাঁদিকের সিঁড়ি দিয়ে—

উপরে উঠিলাম, কিন্তু যাহার জন্য গেলাম তাহাকে পাইলাম না। না পাই কিন্তু বুড়িটার চালাকি বুঝিলাম।

আবার একদিন।—সন্ধ্যার পরেই গিয়াছি।

সরাসর উপরে উঠিয়া দেখি—সে সব ঘর দো'র যেন ভোজবাজীর মত বদলাইয়া গেল। বুঝিলাম—একই বাড়ীর দুইটি দরজা।—অপরিসর এবং অপরিষ্কার একখানা ঘর। দোরের কাছে দাঁড়াইয়া বলিলাম, কেউ আছ?

আছি—এস—এস। বলিতে বলিতে যে বাহির হইয়া আসিল তাহার দিকে না চাহিয়াই বলিলাম, একটা পাগ্‌লি থাকে এখানে—?

ওঃ আসুন—এই ঘরেই—

অ্যাঁ, তুমিই ত। এইটুকুই আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। নিজের সংজ্ঞাও যেন হারাইয়া ফেলিলাম। তাহার মূল্যবান আভরণ গুলা হইতে আর চোখ নামাইতে পারিলাম না।

সে হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিল, তোমায় দেখেই সেদিন চিনেছিলুম। এত বড়টি হয়ে গেছ!—আমায় বোধ হয় আর মনেই পড়েনা?

আবার বলিল, অত রোদে রাস্তায় ঘোরে কি? ছেলে বেলা থেকে একেই ত ঐ শরীর!

বলিলাম, তবে তুমি পাগল হওনি?

পাগল বৈ কি—নৈলে এমন মতি গতি হবে কেন? তোমায় অনেকদিন ধ'রে খুঁজেছিলুম—পাইনি—এসব রাস্তা মাড়াওনা বুঝি? বলিয়া আবার একটু হাসিয়া সে আলোর দিকে চাহিল।

বলিলাম, এর চেয়ে মরে গেলে না কেন?

সে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপর মাথা নীচু করিয়া বলিল, তুমিই বা আত্মহত্যে করনি কেন?

আর দাঁড়াইতে ইচ্ছা হইল না—হন্ হন্ করিয়া নীচে নামিয়া গেলাম। একটা কথা কানে আসিয়া বাজিল, অ বাবু, বাবু, আপনার সিকিটা নিয়ে যান্—

নারীর পায়ে নমস্কার।

আমার মধ্যে বাসনার যে দৃষ্টি সজাগ ছিল তাকে অন্ধ করিয়া দিলাম।

তবু হাসি আসে। চারুকে যে ভাল বাসিয়াছিল—সে কি আমি? তাই যদি হয় তবে সে ভালবাসা ত শেষ হইয়া গিয়াছে—পাঁচ বছর আগে! মন থেকে ত তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছি।

অথচ কেমন করিয়া মনে আসে যে ভালবাসার অধিকার আমার নাই। নহিলে ভালবাসা যে আবার ভুলিতে পারা যায়—ভালবাসা বদলায়—এ দুঃসাহসিক কল্পনা আমার মাথায় আসে কেন? আমারই যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—সেইটাই আসল কথা।......

সত্য কথা বলিতে কি—চারু আমার মনে দাগ কাটিয়া

বসিয়া আছে। কিন্তু পতিতার উপর ত আমার সুদৃষ্টি নাই। চারু মরিয়াই গেছে ইহাই জানিয়া রাখিয়াছি—তবে আর তাহার এ কঙ্কালের প্রতি আকর্ষণ কেন?

ফতোয়া দিলাম চারু মরিয়া গেছে। কিন্তু চারুও মরে নাই, আমিও তাহাকে মন হইতে তাড়াইতে পারি নাই—ইহাই সত্য কথা।

আজ এই সত্য কথাটাই আমায় পাইয়া বসিল। ভয় পাইয়া গেলাম। পাইবারই কথা!

মনে পড়িয়া গেল—মানবদেহের সে বীভৎস পরিণতি! সেই ক্ষুধার্ত্ত লুব্ধ মুখের হাসি! তাহার কি কোনও ইঙ্গিত আছে?

এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

চোখের উপর আবার সন্ধ্যার অন্ধকার ঝুলিয়া পড়ে। আঁধারের গভীরতা দেখিলে ভয় করে। কিন্তু আজ আমি ইহাকে পরাজিত করিব।

প্রলোভনের দাসত্ব করিয়াই ত মানব-জীবনের অবসান!

দোকানে উঠিয়া পয়সা দিলাম। তরল আগুন খানিকটা গেলাসে ঢালিয়া দিল। এক চুমুকে শেষ করিয়া নামিয়া পড়িলাম। দু'মিনিটও লাগিল না।

শুধুই মনে পড়ে নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়াছি—আর অনভ্যাসের দরুণ বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতেছে। করুক। এতদিন ধরিয়া কেবল জীবনের নীরস দেনা-পাওনার হিসাব গণিয়াছি—কিন্তু ক্ষুধিত অন্তরাত্মার আহার্য্য অপহরণ করিবার অধিকার আমার নিজেরই কি আছে?

উপরে উঠিয়া ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়াইয়া বলিলাম, আছ নাকি?

নিজের মনেই একটু হাসিলাম,—বাড়ী যাইতেছিলাম যে—!

চারু তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, আজ আবার যে—?—ওকি, ছাইপাঁশ গিলে আসা হল বুঝি?

উত্তর দিলাম না। ভিতরে গিয়া বিছানাটার ধারে বসিয়া পড়িতেই সে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, ওটাতে না—ওটা নোংরা—এই মাদুরে ব'স—বলিয়া তাড়াতাড়ি মাদুর পাতিয়া দিল। আমি তাহাতে উঠিয়া বসিলাম।

বসিলাম বটে, কিন্তু আর বসিবার শক্তি ছিল না। আড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম। সে তাহা দেখিয়া একটু ক্ষীণ হাসি হাসিল।

কতক্ষণ পরে অন্ধকারে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলাম, চারু?

কি সতীশ দা?

আমায় মাপ করবে?

আবার উভয়ে নীরব। সে নীরবতার তল বুঝি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আমি পুনরায় বলিলাম, বল, কর্ব্বে কিনা......কার জন্যে? এ-সব কার জন্যে বল ত? বলিতে বলিতে সহসা উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, আমি তোমায় তেম্‌নি করে দেখতে চাই—তেম্‌নি সুন্দর ফুলটির মতন—তোমার পায়ে পড়ি বল—বল চারু?

সে তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ওকি বক্তৃতা করছ নাকি! বলিয়া তৎক্ষণাৎ কাহার উদ্দেশ্যে যুক্ত করে একটি প্রণাম করিয়া সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কহিল, যদি তেম্‌নি না দেখতে পাও?

আবার চুপ করিয়া রহিলাম। একটু পরে আবার ডাকিলাম, চারু?

চারু মুখ তুলিল।

মনে পড়ে? বিজয়া দশমীর কথা মনে পড়ে?

পড়ে বৈকি—সে পাগ্‌লামী কি ভোলবার?

পাগ্‌লামী? বলিয়া তীব্রবেগে আমি উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, আজই হয়ত পাগ্‌লামী করছি চারু, কিন্তু সেদিনকার সেটা সত্যি। আজ তোমায় হয়ত ভুলতে পারি, কিন্তু সেদিনকার সে চারুকে ভুলব না—ভুলতে পারব না। মিথ্যে নয় চারু—একথা আমার মিথ্যে নয়—

আবার শুইয়া পড়িয়া বলিলাম, চারু?

কি?

তাহার সজল কণ্ঠস্বর শুনিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম, তোমার অসুখ বুঝি?

সে একটু নীরব থাকিয়া বলিল, অসুখ ত অনেক দিন থেকেই—মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে—কদিন আবার বেড়েছে—

রক্ত! কি যে বলিব কিছু ভাবিয়া পাইলাম না।

তারপর বলিলাম, চল, আমার ওখানে চল, সেখানে কেউ নেই—বলিয়া উঠিয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিলাম।

চারু আঁচল দিয়া চোখ মুছিল—মুখে কিছুই বলিল না।

তাহার পর উভয়েই নীরব।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া বেশ টের পাইলাম অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে চারু আমার মুখ মাথা ধুইয়া মুছিয়া বাতাস করিতেছে—

আসল কথাই বলিতে ভুল! আমার স্ত্রীর নাম ইন্দু।

সে প্রায়ই বলে, আজকাল ওই ইয়েদের পাড়ায় যাওয়া হয় নাকি? অমন পয়সা নাই বা হল? শেষকালে কি?

হাত ছাড়া হবে? আমি বলিয়া ফেলি।

আমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া সে রাগিয়া আগুন হয়। বলে, জানি গো জানি—চারুত তার নাম—পকেট বইয়ে তার নামের ছড়াছড়ি—বলিয়া হাসিয়া ফেলে।

কদিন হইতেই চারুর অসুখের বাড়াবাড়ি—যক্ষার বোধ হয় শেষ পরিণতি!

চিকিৎসার ত্রুটি করিলাম না, কিন্তু কোনও ডাক্তারই ভরসা দিল না।

কাজে অকাজে রাস্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই। কিন্তু কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাই না।

তাহার কাছে যাই কিন্তু বসিতে পারি না। কি যে বলে, শুনিয়া চোখে জল আসে।

ওধার হইতে দু'একটা কথা কানে আসে, পছন্দকে বলিহারী যাই—যেন হাড়গিলে—

খুট্—খুট্ করিয়া দরজায় কে আঘাত করিল।

না কেউ নয়। একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনেই হাসিলাম! ডাক্তারী অভিজ্ঞতায় জানিয়াছি, শেষ রাত অবধি জাগিয়া চিন্তা করিলে এমন অনেক ভৌতিক কাণ্ড ঘটে!

আবার—খুট্—খুট্—

দূর হ'ক গে—বলিয়া মুড়ি দিয়া বালিশের ভিতর মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকাল বেলা গোলমাল শুনিয়া যখন বাহিরে আসিলাম, দেখি আমারই দালানে লোকজন জড়ো হইয়া গিয়াছে।

ইন্দু বলিল, ম'রে গেছে অনেকক্ষণ! আর দেখে কি হবে? যত মরণ এই বাড়ীতেই—

বিকৃত বীভৎস মুখখানা—তবু চিনিতে ভুল হয় কি? কস্ দিয়া মাটিতে রক্ত গড়াইয়া আসিয়াছে। তাহাতে বিড় বিড়ে মাছি। চোখ দুইটা ঘোলাটে!

ডাক্তার দেখাতে এসেছিল—আহা—সবুর সইল না—। কে একজন বলিল।

সমুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ভাঙা বাড়ীটার মাথার উপরে প্রভাতের আকাশ কখন পাণ্ডুর হইয়া গেছে—বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন, অর্থহীন!

এইখানেই আমার এ কাহিনীর শেষ নয় কি?

চয়নিকা

শৈলবনের সরসীতটে

শ্রী অতুলপ্রসাদ সেন

তোর শীতল কোলে তুলে নে আমায়।
তোর মেঘে-ঢাকা পাখী-ডাকা শ্যামল শাখায়।
হেথা তোর বিজন বনে, হাসে ফুল আপন মনে ;
কেউ তারে দেয় না ব্যথা বিচ্ছেদ-ব্যথায় ;
হেথা নাই খাঁচার বাধা, নাই পরের বচন সাধা ;
হেথা গান গাহে পাখী সুখের হেলায়।
পাষাণের বক্ষ-ঝরা, সরসী স্নেহভরা ;
কূলেতে ফুলের বিথান বিটপীর ছায় ;
হেথা তোর বনের গাওয়া, রঙীন ঐ পাখীর নাওয়া,
হেথা তোর মৃদুল হাওয়া—মোর সকল ভুলায়!
সুন্দরের কুঞ্জবনে, নীরব বেণু-গুঞ্জনে,
কে যেন ডাকে আমায়—আয়, আয়, আয়!
তারই সনে থাক্‌ব হেথা, ঘুচাব মোর সকল ব্যথা ;
চুপি চুপি কতই কথা কব দুজনায়!

—উত্তরা, ভাদ্র, ১৩৩৩

চুপ চুপ

বীরবল

সেদিন বঙ্গবাণীতে দেখলুম, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে, আজকাল মুখ ফুটে কোন কথা বলা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কেউ যদি এমন কোনও কথা বলতে উদ্যত হয়, যা পলিটিক্‌সের মামুলি বুলি নয়—তাহ'লেই চারদিক থেকে বিজ্ঞ পলিটিসিয়ানরা ব'লে ওঠেন, "চুপ চুপ।"

পলিটিসিয়ানদের স্বধর্ম্মই হচ্ছে,—কাউকে এমন কোনও কথা বলতে না দেওয়া, যা তাঁদের কথার পুনরাবৃত্তি নয়। মানুষে যাকে গবর্ণমেণ্ট বলে, সে বস্তু ত পলিটিক্‌সের একটা অঙ্গ বই আর কিছুই নয়, এবং প্রকৃতপক্ষে সব চাইতে বড় অঙ্গ। আর সকল দেশে সকল যুগে গবর্ণমেণ্টের প্রয়াস হচ্ছে,—নীরবতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রবৃদ্ধ হওয়া।

আর গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার উদ্দেশ্যে দেশে যে-সকল পলিটিকাল সঙ্ঘ গঠিত হয়, সে সবও নৈসর্গিক নিয়মে গবর্ণমেণ্টের হালচাল অবলম্বন করতে বাধ্য ; কারণ,

সে সব সজ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একদিন না একদিন গবর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। সুতরাং এমন কোনও কথা তাঁরা কাউকে বলতে দিতে চান না, যাতে ক'রে তাঁদের চলতি পথে বাধা ঘটে।

এইটিই যে পলিটিক্‌সের সনাতন ধর্ম্ম, সে কথা স্বয়ং মাকিয়াভেলি আজ পাঁচশ' বৎসর আগে ব'লে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, যে পলিটিসিয়ানের দল একদিন গবর্ণমেণ্ট হবার আশা রাখে, তাদের জানা উচিত যে, লোকমত তারা উপেক্ষা করতে বাধ্য, এবং সে মতকে ছলে বলে কৌশলে চেপে দেবার চেষ্টা তাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। এতে ভয় পেলে তারা কস্মিন্‌কালে শাসনকর্ত্তা হ'তে পারবে না। কারণ, শাসনকর্ত্তার কাজই হচ্ছে জনসাধারণকে শাসন করা, তাদের সঙ্গে প্রেম করা নয়। মাকিয়াভেলির মতামত একালে অসাধু ব'লে গণ্য। কিন্তু তাঁর দুর্নীতির কথা আজও যে লোকে শোনে তার কারণ, সে সব কথা একেবারে অসত্য নয়। অপরকে চুপ করবার হুকুম একমাত্র পলিটিসিয়ানরাই দেন না। যেমন এক দলের লোক রাজ্যের দোহাই দিয়ে অপরের মুখ বন্ধ করতে চান, তেমনি অন্য দলের লোক, কেউ বা নীতির দোহাই দিয়ে, কেউ বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আমাদের ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে থাকৃতে আদেশ দেন। অর্থাৎ যাঁরাই পৃথিবীর কোনও একটা মহৎ ব্যাপার নিয়ে কথার ব্যবসা খোলেন, তাঁরাই কথা-বস্তুকে একচেটে করতে চান। কারণ এ ভয় তাঁদের মনের ভিতর চব্বিশ ঘণ্টা জাগে যে, কে কোথায় কোন্ সত্য কথা ফস্ করে ব'লে ফেলবে, আর অমনি তাঁদের ব্যবসা মারা যাবে।

এ প্রবৃত্তির সঙ্গে ঝগড়া করা বৃথা, কেননা এটা হচ্ছে মানুষের একটা আদিম প্রবৃত্তি। আমরা কি দিনে দু'বেলা ছোট ছেলেদের বলি নে—"চুপ চুপ"? আর তার কারণ কি এই নয় যে, তারা অস্থানে অসময়ে এমন সব সত্য কথা ব'লে বসে, যার দরুণ আমাদের বিপদে পড়তে হয়?—সত্য কথাটা যে মারাত্মক, তা যিনিই ছোট ছেলে নিয়ে ঘর করেছেন, তিনিই জানেন। এখন আমাদের মধ্যে যদি এক দল এমন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান লোক থাকেন, যাঁরা আর সকলকে কাণ্ডজ্ঞানহীন ছোট ছেলে বলে' মনে করেন, তাহ'লে তাঁরা উঠতে বসতে আমাদের মুখে হাত দিতে বাধ্য, কেননা তাঁরা পরম কৃপাবশতঃ লোকহিতের জন্য দল গড়তে বাধ্য। আর যাঁরা দল বাঁধেন, তাঁরাই তাঁদের মতামতকে শৃঙ্খলিত করতে বাধ্য, এবং যে মত তাঁদের গড়া শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে নি, তাকেই উচ্ছৃঙ্খল বলতে বাধ্য। দল বাঁধাটাও মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি, একালের মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা যাকে বলেন herd instinct; এ মনোবৃত্তির পরিচয় সর্ব্বপ্রকার জীবের মধ্যেই পাওয়া যায়। মানুষে যাকে বলে দল, সে বস্তু হচ্ছে পশুরা যাকে বলে "পাল"—তারই মানব সংস্করণ।

সুতরাং "চুপ চুপ" আদেশে আর কারও কোনও ক্ষতি নেই,—সেই অল্পসংখ্যক লোকের ছাড়া, যারা নিজের আত্মাকে কোনও প্রকার দলের অন্তরে বিলীন করতে পারে না। এ শ্রেণীর দু'দশ জন লোক সব দেশে সব যুগেই থাকে। আর তারা সব বিষয়ে সত্যকথা বলবার জন্য লালায়িত। এ শ্রেণীর লোকদের সব দলের দলপতিরা, আর সেই সঙ্গে তাঁদের অনুচররা চিরকালই ভয় করেন; অন্ততঃ তাঁরা এ ভরসা পান না যে, এরা দেশকাল বিবেচনা ক'রে কথা কইবে, বরং ভয় পান যে ছোট ছেলের মত যখন যা মনে হয়, এরা তাই ব'লে বসবে। এ আশঙ্কা অমূলক নয়। যে সত্য কথা বলতে চায়, তাকে সে কথা বেপরোয়াভাবেই বলতে হবে। সত্য কথার ফলাফল কি হবে, সে কথার বিচার করতে বসলে কথা বলা যায়, কিন্তু সত্য বলা যায় না। গীতার একটি বচন একটু বদলে নিলে দাঁড়ায় এই যে,—মানুষের সত্য কথা বলবার অধিকার আছে, কিন্তু "মা ফলেষু কদাচন।" "যোগস্থ বদ বাক্যানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়,—"এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করবার যাঁর সাহস নেই, তাঁর সত্য কথা বলবারও অধিকার নেই। এর প্রমাণ দর্শনের বিজ্ঞানের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। আর

পলিটিক্‌সই বল, ধর্ম্মই বল, ও দুয়ের কোনটিই দর্শন-বিজ্ঞানের অধিকারবহির্ভূত নয়। সুতরাং যাঁর ইচ্ছে তিনিই নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে যা সত্য ব'লে মনে করেন, অবাধে তাই বলতে পারেন, যদি না তিনি কোনও দলবলের চোখ-রাঙ্গানি অথবা চোখ-ঠারা দেখে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। জনৈক পেশাদার অভিনেতা আমাকে একবার বলেছিলেন যে, রঙ্গমঞ্চে উঠে দর্শক-শ্রেণীকে বাঁদর মনে করলেই নির্ভয়ে ফূর্ত্তিসে act করা যায়। কথাটা যদি সত্য হয় ত, আমার মতে একঘরে লেখকরা যদি দলকে herd ব'লে চিনতে পারেন, তাহলেই তাঁদের কলম ফূর্ত্তিসে চলবে।

সে যাই হোক, "চুপ চুপ" আদেশটা আজকালকার দিনে মানাও কঠিন, এবং মানা সঙ্গত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

বৈষ্ণবরা বলেন :—

"বিষয়-বালিসে আলিস্ রেখো,
দেখো যেন ঘুমায়ো না"

আমরা দেশসুদ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় গোটাকতক পলিটিকাল বুলির বালিসে আলিস্ রাখতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আর সেই জন্য দুদিন আগে সেই বুলির বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে গেলেই সহৃদয় লোকেরা অমনই তাদের ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলতেন "চুপ চুপ"।

কথা কইলেই যে সকলের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। আর আধ্যাত্মিক লোকেরা এ কথাও আমাদের বুঝিয়েছেন যে, এ ঘুম যে-সে ঘুম নয়, একেবারে যোগনিদ্রা। আমরা যারা বিশ্বাস করি নি যে, শিক্ষিত সমাজ স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বরাজ্যে গিয়ে পৌঁছবে, আমরাও বেশি কিছু উচ্চবাচ্য করি নি, কারণ জানতুম যে দেশের লোকের যোগনিদ্রা ভাঙ্গানো আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে অসাধ্য।

তারপর একদিন মুসলমানদের এক ধাক্কায় হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। ফলে আমরাও বেশির ভাগ লোক এখন হতভম্ব ভাবে চোখ রগড়াচ্ছি, আর জনকতক ঘুমের ঘোরে সেই সব পুরানো বুলিই এলোমেলো-ভাবে আওড়াচ্ছেন। এ অবস্থায় যাঁদের দস্তুরমত চোখ খুলেছে, তাঁদের মনে নানা কথা উদয় হচ্ছে। এ সময়ে "চুপ চুপ" বলার সার্থকতা নেই। যারা জেগে উঠেছে, তারা সে আদেশ মানবে না। আজকের দিনে যাঁরা নিজের মনের কথা বলতে পারেন, তাঁদের কথাই আমরা শুনতে চাই, আর তাঁদের কথাই শোনবার যোগ্য। তাঁরা কথা কইতে আরম্ভ করলে, চুপ-চুপ-ওয়ালারাও চুপ হয়ে যাবে। আর এ কাজ লেখকেরা নির্ভয়ে করতে পারেন। সব কথা স্পষ্ট ক'রে বলাকওয়ার ফলে, স্বরাজের তারিখ এগিয়ে না আসুক, অন্ততঃ পিছিয়ে যাবে না।

—সবুজপত্র, আশ্বিন, ১৩৩৩

মায়ার বাঁধন

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

বন্ধুবান্ধব প্রিয় পরিজন, আত্মীয় স্বজন, এমন কি রাস্তার সেই লোকটি—যাহার মুখ হইতে আমার সম্বন্ধে দুটি মিষ্টি কথা বাহির হয়, আর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের সেই খোঁড়া ভিখারীটা—যে আমাকে কেরাণী হওয়া সত্ত্বেও রাজাসাহেব বলিয়া অভিবাদন করে, ইহাদের কাহারো মৃত্যু কামনা করিতে পারি না; ইহাদের অপসারণে অল্পাধিক দুঃখ আসিয়া আঘাত দেয়। আবার শত্রুর অমঙ্গল কামনা করিতেও মন সদাই উন্মুখ। আত্মীয় অনাত্মীয়ের এ এক নিদারুণ বিরোধ।

যে-কেহ আমার আত্মীয় সে আমারই আত্মপরিচয়কে তাহার মধ্যে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, সম্ভব হইতে দিয়াছে, আমাকে সে আমার ক্ষুদ্র কূপ হইতে বাহির হইয়া হাত-পা ছড়াইতে দিয়াছে, আমাকে বৃহৎ করিয়াছে, অজ্ঞাতের রাজ্য হইতে পরিচয়ের রাজ্যে প্রকট করিয়াছে, আমার

চোখের সমুখে আমার রূপকে তুলিয়া ধরিয়াছে। আমার নিকটে আমার যে পরিচয় নাই, ঐ আত্মীয়দের কৃপায় আমার সে পরিচয় এই বিশ্বজগতে চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছে। এ আমার এক মস্ত আত্মপ্রসাদ।

যে আমার অনাত্মীয় সে হয়ত আমার সম্বন্ধে নিতান্তই উদাসীন। সে আমার অস্তিত্ব বিস্তৃতির পথে একখানি নিশ্চল প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে; সে আমায় আঘাত করে না, কিন্তু ব্যাঘাত জন্মাইতে তাহার এতটুকু অবহেলা নাই। আর যদি সে উদাসীন না হয়, তাহারও যদি আমার সম্বন্ধে কোনো চেতনা জাগে সে আরো সাংঘাতিক। যেখানে আমি স্থান চাই সেখানে গিয়া সে জুড়িয়া বসিবার সংগ্রাম করে, আমার হাত-পা কাটিয়া খর্ব্ব করিয়া সে তাহার প্রসার সন্ধান করিতে থাকে।

তাই যে-কোনো আত্মীয়ের মরণে আমারই আংশিক মরণ হইয়া যায়। যাহার চোখের দৃষ্টির মধ্যে আমার একটি বিশেষ পরিচয় জাগিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টির আলো যেদিন নিবিয়া যায় সেদিন আমি আমার পাওয়া আমিকে হারাইয়া ফেলি; মরণ-মহাসাগরের নিষ্ঠুর তরঙ্গরাশি আমার আত্মপরিচয়ের এ দ্বীপখণ্ডটিকে গ্রাস করিয়া আমায় ক্ষুদ্র করিয়া দেয়। তেমনি অনাত্মীয়ের মরণে, শত্রুর সংহারে আমার পরিচয়-সাম্রাজ্য স্থাপনের পথটি নিরুপদ্রব হয় বলিয়া আনন্দ পাই।

আত্মীয়-অনাত্মীয়ের প্রতি আমাদের মনোভাবের মর্ম্মকথা এইভাবেই একদিন শুনিয়াছিলাম এবং বুঝিয়াছিলাম।

কিন্তু এই যে হাজার জনের রসনায় এবং দৃষ্টিতে আমার হাজার রকমের মন-লোভানো পরিচয়ের প্রচার ইহা কি সত্য সত্যই আমার পরিচয়? যদি আমারই পরিচয় অমন করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া জানি, তবে শত্রুর প্রতিবাদে ও লাঞ্ছনায় আমার এত শঙ্কা এবং মনঃপীড়া হয় কেন, সেই প্রশ্নটিই মনে জাগিতে থাকে।

আপনাকে সুন্দর বলিয়া জানি না, তাই হাজার চোখের দৃষ্টিতে আপনাকে সুন্দর বলিয়া ধরিবার উগ্র লুব্ধতা অন্তরে বিরাজ করিতেছে। আপনার পরিচয় হয়ত আমার অন্তরে কিছুমাত্রই নাই, কিম্বা যা আছে তাহা হয়ত কেবলই গোপন রাখিবার প্রয়াস আমার; তাই কেবলি আত্মীয়ের মুখর প্রশংসায় আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে চাই। শত্রু আমার সত্যকে গোপন রাখিতে দেয় না; তাই তাহার অস্তিত্ব আমার পীড়াদায়ক হইয়া উঠে।

যাহা শোভন ও সুন্দর, যাহা শ্রদ্ধা এবং প্রশংসার, যাহা কিছু মনোমোহন ও তৃপ্তিকর তাহার মধ্যে আমি আমাকে স্থাপন করিবার প্রয়াসী, কখনো জানিয়া, কখনো না জানিয়া। তাই লোকস্তুতির মধ্যে মন এতখানি বাঁধা পড়ে। লোকের প্রশংসার মায়াপুরীতে আমি আপনাকে সম্রাট করিয়া রাখিতে চাই! কিন্তু মনে মনে মন তো জানে যে উহা মায়াপুরী মাত্র। গোপনের মায়া শুধু আত্মপরিচয়ের নাম লইয়াই দাঁড়াইয়া আছে। তাই শঙ্কার আর শেষ নাই, ভয় আর কাটে না, আত্মীয়ের বন্ধন আর অনাত্মীয়ের বন্ধন কোনোটাই ঘোচে না।

কি যে আমি, তাহার সন্ধান করি না। সত্যকে পাশ কাটাইয়া মিথ্যার লুব্ধতায় দিন কাটে, আর কেবলি মনকে বোঝাই, না, না ওই তো আমি! মা বলে আমি সুন্দর, প্রিয়া বলে আমি দেবতা, বন্ধু বলে আমি প্রিয়, লোকে বলে আমি মহৎ—ওই তো আমার পরিচয়। তবু মন বুঝিতে পারে না যেন! কে যেন ঐ সমস্ত উক্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া গুপ্তচরের মত মৃদু মৃদু হাসে আর বলে, "হুঁ!"

আপনাকে আপনি দেখিতে যেন বড় ভয় পাইয়া যাই; তাই আর-সবাইকে বলি, তোমরা দেখিয়া আমার বলিয়া যাও আর আর—মন্দ কথাগুলো বলিও না। আত্মীয়েরা মন্দ কথা বলে না; কিন্তু বলে না বলিয়াই যে বড় ভাল আছি তা নয়। বরং বলে না বলিয়াই আরো অস্বস্তিতে পাইয়া বসে। কিন্তু এ ভয় কেন? মানুষে নিজের পরিচয় নিজে লইতে এত ভয় পায় কেন?

তাই বুঝি মানুষ চুপ করিয়া থাকিতে চায় না, নির্জ্জনবাস করিতে শঙ্কিত হয়?

যাহা সত্য তাহার প্রকাশ নিঃশঙ্ক। সে অকুণ্ঠিত। আমি আমাকে যাহা বলিয়া অন্তরে অন্তরে জানিতেছি, নিয়ত তাহা আমি প্রচার করিতে কেন তবে এতখানি কুণ্ঠিত লজ্জিত আর ভীত হইয়া পড়ি? আর কেউ বা যদি সে কথা বলে তাহাতেই বা এত বিহ্বল হইয়া পড়ি কেন? শত্রু বলিয়া তাহাকে তখন কেনই বা প্রচার করিতে থাকি? যদি কেউ মিথ্যাই বলিয়া থাকে তাহাতে ত আমার চঞ্চল ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িবার কোনো কারণই থাকে না! শত্রু কোনো না কোনো ভাবে আমি যাহা গোপন রাখিতে চাই তাহাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে বলিয়াই তাহার উপর চটিয়া উঠি, বলি, ও শত্রু, অর্থাৎ ওর কথা তোমরা কেউ বিশ্বাস করিও না। কেন এই সত্য-ভীতি? কি সে মিথ্যামায়া আমাদের পাইয়া বসিয়াছে যাহাতে পরস্পরের কাছে আমরা আপনাকে অনাবৃত করিতে পারি না?

প্রীতির কামনা শেষকালে মানুষকে ভীতির জালে বাঁধিয়া রাখিবে, কথাটা ভাবিতেও আশ্চর্য্য লাগে! প্রীতির পথ মুক্তির পথ, মিলনের-পথ, সে-পথ ভীতি-কণ্টকিত হইয়া উঠিল এ এক অদ্ভুত ব্যাপার!

অন্তরে অন্তরে আমরা জানি মানুষ, মানুষের বৃহত্তর কোনো সত্তাকেই প্রীতির অর্ঘ্য দেয়, তাহার দুর্ব্বল বন্ধন আতুর চিত্তকে নয়। ইহা জানি বলিয়াই প্রীতিকামী হইয়াও আমরা পরস্পরকে ভয় করি, গোপন করি আমাদের যেখানে দৌর্ব্বল্য, যেখানে বাঁধন। কামের হাতে আমরা ধরা পড়িয়া আছি, সেই কারণেই সেই কথাটি গোপন; যত নীচতা হেয়তা আছে সে-সবের মধ্যে বন্ধন আছে, তাই তাহা গোপনীয়। অন্তরের না-জানি সে কোন্ অলজ্ঘ্য মর্য্যাদাবোধ মানুষকে তাই সেই মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অক্লান্ত চেষ্টায় গোপনতাপ্রিয় এবং মিথ্যাচারী করিয়া তোলে! যে সত্যের মধ্যে তাহার মর্য্যাদা তাহাকেই সে পদদলিত করিয়া চলিতে থাকে। আজ যাহা আমি নই সেই মিথ্যাটাকেই মানুষ শ্রদ্ধা করুক, সম্মান করুক, আর সেই সম্মান শ্রদ্ধা এবং প্রীতি আমি চোরের মত হরণ করি এত বড় অসত্য কামনা, এতখানি অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাও তখন মায়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সহজ ঠেকিতে থাকে। অপরূপ এই মায়ার বাঁধন পড়িয়াছে আমাদের চিত্তে! এই অপহৃত শ্রদ্ধারাশি কখনো আমি আমার বলিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে গলায় পরিয়া বাহির হইতে পারি না, তবু ইহাকেই জড়ো করিবার দুরাশায় কেবলি জাল পরিচয়ে বন্ধুত্বের ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছি।

এই যে বাঁধন—ইহা কাটিবে কিসে, কেমন করিয়া,—অন্তর যে এ প্রশ্নটা কখনো কখনো শূন্যপানে চাহিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে না তাহা নয়। আর সে প্রশ্নের উত্তরও পাই কখনো কখনো। যখন কোনো মানুষ তাহার সবখানি-আপনাকে কখনো কখনো দারুণ দুঃসাহসে ব্যক্ত করিতে থাকে তখন তো তাহার মধ্যে যাহা হেয়, যাহা ঘৃণিত, তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে ঘৃণা করিতে বসি না। তাহার সেই অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশকে শ্রদ্ধা করি, তাহাকে আমরা ভালবাসি। কেন? সে যে আমাদেরই অন্তরের তীব্র কামনাটিকে ব্যক্ত করিতে থাকে। সহজ হইবার, সত্য হইবার, অকুণ্ঠিত হইবার, মুক্ত হইবার পথটিকে সে তখন একেবারে সোজা চোখের সামনে ধরিয়া দেয়—তাই তাহাকে ভালো লাগে। মানুষের খাঁটি আত্মজীবনী তাই এতখানি পূজা পায়, আবার মানুষের জীবনস্মৃতির মিথ্যা বর্ণচিত্র তাই মানুষকে বিদ্রূপ করিয়া তোলে। সোজা পথটি তো সেই মানুষ দেখাইয়া দেয়, তবু তো সেই পথে পা ফেলিতে পারি না! পথ পড়িয়া থাকে, আমরা ভীত চিত্তে পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াই।

কারণ পথে নামিতে হইলে একটা জগৎকে ভাঙিতে হয়। আমার মিথ্যা মানের লালসা দিয়া যে মণ্ডলী সৃষ্টি করিয়াছি সেই আমার মিথ্যার জগৎটিকে ভাঙিয়া দিয়া একেবারে কাঙাল হইয়া মুক্তির পথে নামিতে হয়—বড় ভয় করে। তাই আপনি না জাগিয়া, চোখ না খুলিয়া, পা না বাড়াইয়া কেবলি কোন্ আশ্চর্য্য ভগবানের পায়ে

স্তব আওড়াইতে থাকি, আর আশা করিতে থাকি যে, অকস্মাৎ একেবারে আলাদীনের প্রদীপের মত কোন একটা দৈব আসিয়া আমাদের চিত্তকে মুক্তির আলোতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে। কেবলি তাই ভগবৎ-কৃপার সন্ধান, স্বকীয় সাধনার ও পুরুষকারের চেষ্টার তাই একান্ত অভাব। ফলে, পা না বাড়াইলে যে পা নড়ে না, আর বসিয়া থাকিয়া যে পথ হাঁটা যায় না, এই সত্যটাই নির্ভুল-ভাবে প্রমাণ করিয়া এই মানবজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

যে-মিথ্যার বিপুল জগৎটি আমরা গড়িয়াছি, আপনার রক্তমাংসের চেতনা দিয়া যাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছি, তাহাকে কাটাইবার দারুণ বেদনা জাগিবে কবে? কবে রুদ্ধশ্বাসে অন্তরাত্মা 'আর পারি না' বলিয়া এই মায়ার বাঁধন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া যাইবে?

—উত্তরা, ভাদ্র, ১৩৩৩

ডষ্টয়িভ্‌স্কি

মার্গট রবার্ট এডাম্‌সন্‌

মস্কোর শ্রমিক-হাঁসপাতালের দরিদ্র চিকিৎসক দুইখানি মাত্র ঘর লইয়া যে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ছিলেন তাহার মধ্যে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ডষ্টয়িভ্‌স্কির জন্ম হইল। কিন্তু তখন কে জানিত ষাট্‌ বছর পরে তাঁহার মৃতদেহ অনুসরণ করিয়া পেট্রোগ্রাডের সমাধিক্ষেত্রে চল্লিশ হাজার নর-নারী সমবেত হইবে! বল্‌শেভিক রাষ্ট্রও আজ তাঁহার উদ্দেশ্যে স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন!

ক্ষমতাশালী ঔপন্যাসিক ও সূক্ষ্ম সমালোচক মেরেজ্‌কোভ্‌স্কি ডষ্টয়িভ্‌স্কিকে "প্রফেট" এবং ততোধিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন,—আবার ব্রাণ্ডেসের কাছে তিনি অধঃপতিত, রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার বিদ্রোহীরূপে দেখা দিয়াছেন। তাঁহাকে লোকে দার্শনিক ও জীবন্ত অধ্যাত্মতত্ত্বের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে,—আবার গোর্কির প্রশ্নের উত্তরে সূক্ষ্মদর্শী টলষ্টয় বলিয়াছেন, "তাঁহার রক্ত-মাংসের প্রতি কণাতে তিনি বিদ্রোহী;—তাঁহার অনুভূতি খুব নিবিড় এবং প্রখর, কিন্তু চিন্তাশক্তি বড় দুর্ব্বল।"

সাধারণ পাঠক এই সমস্যার সমাধান, এই প্রহেলিকার উত্তর কেমন করিয়া পাইবে? আজ সমগ্র ইউরোপখণ্ড জুড়িয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া সাহিত্য-সমাজে প্রবল ঝড় উঠিয়াছে,—কেহ বা তাঁহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস-কারদিগের আসনে বসাইয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে, আবার কেহ বা তাঁহাকে অনুরূপ আন্তরিকতা সহকারে অবজ্ঞা করিতেছে।

ডষ্টয়িভ্‌স্কির জীবনী ও চিঠি-পত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ১৮২১ হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন-ব্যাপী এই সুদীর্ঘ ষাট্‌ বৎসর কালের উপর দিয়া অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা অনেক বৃষ্টিপাত হইয়া গিয়াছে, কত অপূর্ণ, অর্দ্ধপূর্ণ আশা-ভরসা, কত বিচিত্র স্বপ্ন, কত বিরাট কীর্ত্তি দ্বারা ইহা চিহ্নিত হইয়া আছে! ষ্ট্যাক্‌হাউ তাঁহাকে ভালো করিয়া জানিতেন; তিনি বলিয়াছিলেন, "ডষ্টয়িভ্‌স্কির যাহা কল্পনায় ছিল তাহার দশ ভাগের এক ভাগও তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই!" ডষ্টয়িভ্‌স্কি নিজেও তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, যাহা তাঁহার বলিবার ছিল তাহা আর বলা হইল না।

কিন্তু তাহা ছাড়া বাহিরের ঘটনাও তাঁহাকে জগতের কাছে প্রহেলিকাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার মাথার উপরে অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কত কঠিন ঝড়-ঝাপ্‌টা বহিয়া গিয়াছে, তাহা বিশ্বাস করাও দুরূহ। জীবনব্যাপী কঠোর দারিদ্র্য, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ লইয়া ফাঁসীর মঞ্চে উঠিয়া নামিয়া আসা, সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন দণ্ডভোগ, 'ইন্‌সালটেড্‌ অ্যাণ্ড ইন্‌জিয়োর্ড' গ্রন্থে যাহার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে সেইরূপ বিবাহে আবদ্ধ হওয়া, ঋণভারে পীড়িত হইয়া উত্তমর্ণের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নির্ব্বাসনে যাইয়া গৃহসুখ-বুভুক্ষিত হৃদয়ে দিন যাপন করা, মৃগী রোগের দুঃসহ যাতনায় জর্জ্জরিত হওয়া,—জীবনের এই চিত্র তো সুখের নয়, ইহাতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। অথচ এই অবস্থার মধ্যেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির পরিকল্পনা করিতে হইয়াছে, লিখিতে হইয়াছে। ১৮৬৬ হইতে ১৮৭৩ অবধি "ক্রাইম্‌ অ্যাণ্ড পানিসমেণ্ট" হইতে আরম্ভ করিয়া "দি পজেজ্‌ড্‌" পর্য্যন্ত সমস্ত বই গুলিই বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তির মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে।

শুধু তাই নয়,—সংবাদপত্রের সাহিত্যাংশের জন্য পূর্ব্ব হইতেই সেগুলিকে বিক্রয় করিয়া দিতে হইত। তাঁহার চিঠি পত্রে রাষ্ট্রনীতি ও দর্শনের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থকৃচ্ছ্রতার অসহায় ক্রন্দন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থগুলি সৃষ্টির আনন্দের মধ্য দিয়া লিখিত হয় নাই;—না লিখিলে দিনপাত হয় না তাই লিখিতে হইয়াছে। লিখিবার ক্ষমতা আছে কি না তাহা বিচার করিবার, ভাবিবার অবসর ছিল না,—ভালো হোক, মন্দ হোক লেখনী বন্ধ করিবার উপায় নাই! অভাব মানুষের যুক্তি তর্ক শুনিতে চায় না। তাই অবশেষে গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত হইলেও, সংবাদপত্রসেবাই তাঁহাকে যশ ও অর্থের সন্ধান কিছুকালের জন্য মিলাইয়া দিয়াছিল।

'আর্টিষ্ট' বা কলাবিৎ হইবার সুযোগ বা অবসর তাঁহার ঘটে নাই এই অভিযোগ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল। মহৎ আর্ট সৃষ্টির জন্য, বিশাল অন্তরের অভিব্যক্তির জন্য, যে শান্তি যে প্রচ্ছন্নতার প্রয়োজন তাহা তাঁহার জীবনে মিলে নাই। অথচ তাহার জন্য সমস্ত জীবন ভরিয়া কত না ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করিয়াছেন! সেই আকাঙ্ক্ষা তো চরিতার্থ হইতে পারে নাই! তাই "দি ইডিয়ট্‌" লিখিতে লিখিতে প্রেসের নিয়মিত কিস্তি পাঠাইবার সময় যখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে তখন ডষ্টয়িভ্‌স্কি বলিতেছেন, "আমার কাছে এরা এখনও মহৎ আর্টের প্রত্যাশা করে! যদি টুর্গেনিভের মত জীবন যাপন করিবার সৌভাগ্য আমার মিলিত তবে কি আমি তাঁর মত লিখিতে পারিতাম না!"

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ড্রেস্‌ডেনে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় যখন 'দি পজেজড্‌' লিখিতেছিলেন তখনই 'এথিজম্‌' এর কল্পনা আসে। এই কল্পনার আংশিক সার্থকতা তাঁহার শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ "দি ব্রাদার্স কারামজফ্‌"—এ ঘটিয়াছিল। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহার পরের গ্রন্থখানি লিখিতে আমি অবসর চাই,—টলষ্টয়ের মত নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আমার একান্ত প্রয়োজন।" ১৮৭১ সালে রাশিয়ায় ফিরিয়া আসিলে "কারামজফ্‌" লিখিবার অবসর তাঁহার মিলিল, এবং সেই সঙ্গে লিখিবার উৎসাহও বাড়িল বটে, কিন্তু দেহ আর খাটিতে চাহিল না—দারুণ অবসন্নতায় তাহা ক্রমশই ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফলে, তাঁহার সমস্ত জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা 'এথিজম্‌' তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোন্‌ মহানীরবতার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল!

তাঁহার লেখাগুলি দায়ে পড়িয়া সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আত্মবিচারের প্রবৃত্তি তাঁহার নিস্তেজ ছিল না। এবং সেই জন্য তাঁহার আর্ট-বুদ্ধি, ও শিল্পচাতুর্য্যের চেতনা-শক্তি কোনও দিনই তাঁহার কাছে নিছক্‌ খেলার সামগ্রী হয় নাই। সাহিত্যের উচ্চ মাপকাঠি হইতে জীবনে ভ্রষ্ট হন নাই বলিয়া মেরেজ্‌কোভ্‌স্কি ও অন্যান্য রসজ্ঞদের কাছে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে শহিদ ও নায়ক বলিয়া পূজা পাইয়াছেন।

ডষ্টয়িভ্‌স্কির কাছে আর্ট তো কেবল মাত্র দৃষ্টি বা পর্য্যবেক্ষণের সামগ্রী নয়,—আর্ট তাঁহার কাছে প্রকাশ

পাইয়াছে প্রবল এবং প্রচুর কর্ম্ম-সাধনার মধ্য দিয়া। আর্টের সৃষ্টি তাঁহার কাছে কর্ম্ম হইতে বিরতির দাবী করে নাই,—প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার শত লক্ষ সংগ্রাম ও অগণিত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য আর্ট তাঁহাকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। জীবনে যাহা কিছু মহত্তম, যাহা কিছু নিবিড়তম তাহাই তিনি সকলের কাছে দাবী করিয়াছেন। এই অতিমানব-জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, জগতের উচ্চতম হইতে গভীরতম স্তরগুলি আপনার মধ্যে ধারণ করিবার এই দুর্দ্দমনীয় আবেগ,—ইহার মধ্যে সময় সময় অতিপ্রাকৃতকতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার রাস্‌কল্‌নিকফ্, ষ্টাভ্‌রগিন্, আইভান্ কারামজফ্—ইহারা যেন সাধারণ মানুষই নয়। একটি মাত্র শক্তির তাহারা কামনা করে না, সমগ্র জগতকে যেন তাহারা হাতের মধ্যে পাইতে চায়। এই মানুষের জগতের মধ্য দিয়া ভগবানের প্রভুত্বের সঙ্গে তাহারা সংগ্রাম করিতে চায়। নিজেদের চিন্তা, কামনা ও অস্তিত্ব দ্বারা তাহারা পৃথিবীর যত কিছু সমস্তেরই অধীশ্বর হইবার কামনা করে। নীট্‌শের পূর্ব্বে ডষ্টয়িভ্‌স্কিই আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, যাহারা অপরাধী তাহারা সবল কিন্তু পীড়িত মানব। তিনি তাঁহার নিজের মধ্যেও সেই পীড়া সেই রোগের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আর বিদ্রোহীরা পরিণামে যে নির্দ্দয় নির্ব্বাসনের মধ্যে প্রাণহীন শূন্যতা অনুভব করেন ডষ্টয়িভ্‌স্কি তাহারও আস্বাদন পাইয়াছিলেন।

সাধারণত মনে হয় যে ডষ্টয়িভ্‌স্কির জীবনকে দেখিবার ভঙ্গি তাঁহার দশ বৎসরব্যাপী সাইবেরিয়া নির্ব্বাসন কালেই গঠিত হইয়াছিল; সাইবেরিয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তেমন কিছু পরিবর্ত্তন আর হয় নাই। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটা আশ্চর্য্য পারম্পর্য্য আছে;—গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্তরে পরিণতির সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে। গ্রন্থগুলি পড়িয়া মনে হয় ইহাদের সকলের মধ্যেই ডষ্টয়িভ্‌স্কি যেন অবিরত সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন। সেই দুরন্ত রোগ যখন তাঁহাকে আক্রমণ করিত তাহার ঠিক পূর্ব্বেই তিনি যে সমস্ত অসাধারণ অনুভূতির আভাস পাইতেন তাহা তাঁহার কাছে অতি সত্য ও সুমহৎ ছিল। তিনি বারবার এই অনুভূতির কাছে ফিরিয়া আসিতেন।

ঈশ্বরের ধারণা তাঁহার সৃষ্ট কিরিলফ্‌কে সমস্ত জীবন ধরিয়া পীড়িত করিয়াছে। সে বলিতেছে, জীবনে এমন সব মুহূর্ত্তও আসে যখন চকিতে জগতের চিরন্তন 'হার্ম্মনি'র আভাস পাই। এই সঙ্গতি, এই সঙ্গীতের মধ্যে তখন এতটুকুও অপূর্ণতা থাকে না। ইহার মধ্যে পার্থিব কিছুই নাই। আমরা মানুষের এই দেহ লইয়া তাহা সহ্য করিতে পারি না। হয় এই দেহের রূপান্তর হয় নতুবা মৃত্যুর স্পর্শ ভিন্ন উপায় নাই। এই অনুভূতির মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা, কোনো ভ্রান্তি নাই। মনে হয় অন্তঃকরণের মধ্যে সমস্ত প্রকৃতির নিবিড় স্পর্শ পাইয়া বলিয়া উঠিয়াছি, "হাঁ, এই তো সত্য!" ইহা গভীরভাবে মনকে নাড়া দেয় না, ইহার কাজ শুধু অকৃত্রিম আনন্দ দেওয়া। ইহা কোনো-কিছুকে ক্ষমা করিতে বলে না, কেন না তখন ক্ষমার কোনো প্রয়োজন থাকে না। কিরিলফ্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নয়, কিন্তু তাঁহাকে সে স্বীকার করিবে না। সে যখন তাহার শূন্যবাদের প্রান্তদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন সে সমস্ত কীর্ত্তি ও কৃতকার্য্যতার মধ্যে আত্মঘাতেরই ইঙ্গিত পাইয়াছে। কিন্তু ডষ্টয়িভ্‌স্কি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি চান, তাহার যুক্তি ও অনুভূতি ইহা প্রমাণ করিবে, নতুবা ইহাতে কোনো প্রয়োজন নাই। ইহার চেয়ে মিতিয়া কারামজফের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাও বাঞ্ছনীয়।

মানব-সভ্যতার বাহিরে সাইবেরিয়ার বিভীষিকার মধ্যে ডষ্টয়িভ্‌স্কি তাঁহার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাসকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি ও মানুষের ইচ্ছার মিলন হইয়া একটা বোঝা পড়া অবশেষে হইবে ইহা তিনি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেন। মানুষের মুক্তি কেবল ভগবানের নিকট মিলিবে ইহা সত্য নয়, মানুষ নিজেও তাহাকে মুক্তি দিবে। মানুষ যদি মহিমা লাভের জন্য তাহার কামনা প্রকাশ করে তবে সে ধ্বংসপথের যাত্রী হইবে না।

সেই জন্য যাঁহারা বলেন যে মানুষকে একটা দয়াহীন প্রতিকূল পৃথিবীর মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদিগকে তিনি অবজ্ঞা না করিয়া পারেন নাই। পৃথিবীর সবই যদি 'কু',—ইহার মধ্যে কিছুই যদি ভালো না থাকে, তবে মানুষের 'সু' হওয়ার কোনো সার্থকতা নাই।

সুতরাং ডষ্টয়িভ্স্কি যখন ধর্ম্মের গোঁড়ামির দিক হইতে মুখ ফিরাইলেন, পাশ্চাত্য জগৎ তাঁহার মধ্যে দ্রোহিতাই দেখিতে পাইল। তাঁহার এই আচরণ অকারণ নয়। সাইবেরিয়ার কঠোরতার মধ্যে তিনি যখন বাইবেল্ পড়িলেন, তখন যীশুর প্রতি যে প্রেম ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হইল তাহা আর কিছুর সহিত তুলনীয় নয়। যীশুর মধ্যে তিনি আশার বাণী শুনিলেন,—তিনি বুঝিলেন যে যীশুই একমাত্র মানুষ, যিনি মানুষের অন্তর দেখিতে পাইয়াছেন, যিনি প্রচার করিয়াছেন যে মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই স্বর্গরাজ্যের অস্তিত্ব আছে। অতিমানবের অপেক্ষাও যীশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য গভীরতর, তবু একমাত্র তাঁহাতেই জগৎ সংসারের সঙ্গে একটা সমন্বয় ঘটিয়াছে। দরিদ্র ডষ্টয়িভ্স্কি নগরে নগরে জীর্ণ ক্লিষ্ট নর-নারীর অব্যক্ত বেদনার মধ্যে এমন কিছু পাইয়াছেন যাহা তাঁহাকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়াছে। এই দুঃখ-বেদনা ভগবানকেও যেন স্পর্দ্ধিত অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতেছে। তাঁহার ইহাও মনে হইয়াছে যে, এই রুশ-বাসীর মধ্যেই, সত্যের প্রতি তাঁহার এই অতৃপ্ত তৃষ্ণা এবং দুঃখ ও সহানুভূতির মধ্যেই খৃষ্টধর্ম্মের সার্থকতা দিনে দিনে সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে,—ইয়োরোপের অন্যত্র নয়। তাঁহার একান্ত আশা ছিল, খৃষ্টধর্ম্ম তাঁহার দেশেই একটা নূতন তাৎপর্য্য, একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি গ্রহণ করিবে। খৃষ্টধর্ম্মের যদি কিছু মাধুর্য্য থাকে তবে তাহা স্বর্গধামেই শুধু আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না, তাহা পৃথিবীতে নামিয়া মানুষের সুখে-দুঃখে, তাহার প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে তাহাকে পথ দেখাইয়া চলিবে, তাহাকে অপরূপ সুষমা-মণ্ডিত করিয়া তুলিবে।

কিন্তু সুদূর রুশিয়াখণ্ডের মৃগী-রোগগ্রস্ত একটি অদ্ভুত লোকের অদ্ভুত আশা ভরসা অদ্ভুত ভয় ভাবনার কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন কি? ১৯১৭ সনে যে দেশের অত্যাশ্চর্য্য বিপ্লব সমস্ত উল্টাইয়া দিয়া গেল সে দেশ পৃথিবীকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যার অভিনব আলোক দান করিবে এ আশা পোষণ করিবার সার্থকতা কোথায়? এই সার্থকতা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি, যখন দেখি, এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও আবেগ-অনুভূতি একজন শিল্পীর উপন্যাসের মধ্য দিয়া বাহির হইয়াছে। ডষ্টয়িভ্স্কির সৌন্দর্য্যানুভূতি, তাঁহার আবেগময় চেতনা কি আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া দেয় না? তাঁহার কাছে রাশিয়া যে মানবাত্মার জীবন্ত প্রতীক!

তাঁহার এই অবিচলিত সদা-জাগ্রত আবেগ ও চেতনার জন্য তিনি চিরকাল আমাদের স্মৃতির মধ্যে অমর হইয়া আছেন। শিল্প সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার একটি সুকোমল বিশ্বাস ছিল—তাহা পরবর্ত্তী যুগে মানুষের কর্ম্মযোগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তিনি যে সকল নরনারীকে তাঁহার কল্পনা হইতে জন্ম দিয়াছেন, তাহাদের প্রায় অধিকাংশের জীবনই এক একটা প্রকাণ্ড ট্রাজেডী। তাহারা সকলেই দুঃখ-দারিদ্র্যের পীড়নে পীড়িত; তবু তাহাদের মধ্যে প্রবল অপরাজেয় অঙ্গার বহ্নি জ্বলিতেছে। মিতিয়া কারামজফের মুখ দিয়া ডষ্টয়িভ্স্কি কহিতেছেন,—আমি সকল দুঃখ, যত কিছু যাতনা সব সহ্য করিতে পারি, যদি শুধু এইটুকু মাত্র জোর করিয়া বলিতে পারি যে, আমি আছি, আমি আছি! সূর্য্য দেখি বা না দেখি কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমি জানি তিনি আছেন, তিনি চিরপ্রকাশমান,—সেই জানাতেই তা জীবন!

"দি পজেজড্" গ্রন্থে ডষ্টয়িভ্স্কি তাঁহার মহত্তম প্রবলতম আশার কথা প্রচার করিয়াছেন। মানুষের ব্যক্তিগত সুখ শান্তি তেমন কিছু প্রয়োজনীয় নয়। সব চেয়ে বড় কথা এইটুকু জানা যে কোনো খানে এমনি পরিপূর্ণ অনাবিল প্রশান্তি আছে যাহা ব্যক্তিগত নয়, কিন্তু সকল মানুষের জন্য। তাহার একমাত্র উপায়, মানুষ প্রভাতে সন্ধ্যায় দিনেরাত্রে সকল সময় জীবনের পথে নতি

স্বীকার করিয়া চলিবে। কিন্তু এই প্রণতি নিবেদন করিবে কাহার কাছে? যে গ্রহ-খণ্ডের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি তাহাতে আমাদের প্রয়োজন আছে, কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীটুকু অতিক্রম করিয়াও যিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন তাঁহাকে আরো বেশী প্রয়োজন। সেই অনন্ত চিরন্তন, সেই শাশ্বতের কাছেই আমাদের সমস্ত নিবেদন!

তাঁর এই মহৎ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিবার অবসর মৃত্যু তাঁহাকে দেয় নাই। কিন্তু তাঁহার কল্যাণে এই প্রাণস্পর্শী ভাব-সম্পদে আমরা বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি।

কোনো রুশীয় সমালোচক ডষ্টয়িভ্স্কি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, দুঃখ বোধের গভীরতার মধ্যেই তিনি জীবনের রহস্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার আর সমস্তই প্রকৃতির কাছে পাওয়া সামগ্রী, কিন্তু এই রহস্যানুভূতি তাঁহার একান্ত আপনার সৃষ্টি।

ডষ্টয়িভ্স্কি গ্রন্থকার এবং ঔপন্যাসিক—তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি, অনেক অনিয়ম আছে। কিন্তু তবু মানব জাতির সেই সব পরিত্রাতাদের মধ্যে তাঁহাকেও আমরা গণ্য করিতে পারি যাঁহারা আপনাদের মেধা দ্বারা রক্ত দ্বারা মানুষের আত্মার মুক্তির জন্য তাহার সুপ্ত শক্তিতে জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন। যে-মানুষের মনুষ্যত্ব তাহার দেবত্বকে জাগ্রত করিয়া দেয় তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি।

—রিভিউ অফ্ রিভিউজ্

অনুবাদক—শ্রী সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

নব নবীনের লাগি—

শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত

—নব নবীনের লাগি'
প্রদীপ ধরিয়া আঁধারের বুকে আমরা রয়েছি জাগি'!
ব্যর্থ পঙ্গু খর্ব্ব প্রাণের বিকল শাসন ভেঙে'
নব আকাঙ্ক্ষা আশার স্বপনে হৃদয় মোদের রেঙে'
দেবতার দ্বারে নবীন বিধান—নতুন ভিক্ষা মেঙ্গে,
দাঁড়ায়েছি মোরা তরুণ প্রাণের অরুণের অনুরাগী!

ঝড়ের বাতাস চাই!
—চারিদিক ঘিরে শীতের কুহেলি,—শ্মশান পথের ছাই,
ছড়ায়ে রয়েছে পাহাড়প্রমাণ মৃতের অস্থি খুলি,
কে সাজাবে ঘর দেউলের পর কঙ্কাল তুলি' তুলি'?

সূর্য্যচন্দ্র নিভায়ে কে নেবে জরার চোখের ঠুলি!
—মরার ধরায় জ্যান্ত কখনো মাগিতে যাবে কি ঠাঁই!

—ঘুমায়ে কে আছে ঘরে!
জাগিয়া উঠিবে চকিতে মোদের গলার ঝড়ের স্বরে!
কে আছে বসিয়া হতাশ উদাস অলস অন্যমনা?
দোদুল আকাশে দুলিয়া উঠিছে রাঙা অশনির ফণা,
বাজিছে বজ্র, নাচিয়া উঠিছে ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা,
নিদ্রিত ভীত চকিতে নামিয়া আয় আমাদের ঝড়ে!

আমরা বিশ্বজয়ী!—
দিকে দিকে মোরা বেড়াই মোদের আশার বার্ত্তা বহি,'
মানবের মাঝে যে দেবতা আছে আমরা তাহারে বরি,
মোদের প্রাণের পূজার দেউলে তাহার প্রতিমা গড়ি,
মিথ্যা-অত্যাচারের বুকেতে উদ্যত ফণা ধরি'
গর্জ্জিয়া ফিরি আমরা তরুণ—বিপ্লবী বিদ্রোহী!

গাহি মানবের জয়!
—কোটি কোটি বুকে কোটি ভগবান আঁখি মেলে জেগে রয়!
সবার প্রাণের অশ্রু-বেদনা মোদের বক্ষে লাগে,
কোটি কোটি বুকে জ্বলে কোটি দীপ—কোটি কোটি শিখা জাগে,
প্রদীপ নিভায়ে মানব-দেবের দেউল যাহারা ভাঙে,
আমরা তাদের শস্ত্র, শাসন, আসন করিব ক্ষয়!
—গাহি মানবের জয়!

———

মানুষ যখন একা থাকে—

ম্যাক্সিম্ গোর্কি

মেয়েটি ফর্‌সা। দেখিতে মোটেই লম্বা চওড়া নয়। বয়স হইয়াছে,—কিন্তু শিশুর অবয়বের অপরিণতি এখনও ঘোচে নাই। পায়ে মোজা,—দুধের সরের মত রং সেগুলির। ট্রোয়িজ্‌স্কি পোলের উপর ছেয়ে-রঙের দস্তানা-হাতে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া। দেখিয়া মনে হয়, এখুনি নেভায় ঝাঁপ দিবে।

তাহার দিকে চাহিয়া আছি। হঠাৎ দেখি, ছোট্ট তীক্ষ্ণ লাল্‌চে জিভখানি বাহির করিয়া সে চাঁদকে ভেংচি কাটিতেছে।

চন্দ্রলোকের সেই আস্থি কালের বুড়াটি, আকাশ-দেশের সেই ধূর্ত্ত শিয়ালটি তখন ময়লা ধোঁয়াটে মেঘের মধ্য দিয়া নিঃশব্দে নিজের পথ করিয়া চলিয়াছে।

তাহাকে আজ খুব বড় দেখায়। টকটকে লাল গাল দেখিয়া মনে হয় যেন সে মদ খাইয়া চুর্ হইয়া আছে। তরুণী মেয়েটি তাকে প্রাণ-পনে বিরক্ত করে। কিসের যেন প্রতিহিংসাও তাহাতে আছে! অন্তত আমার ত তাই মনে হয়।

তাহাকে দেখিয়া কতকগুলি অদ্ভুত কথা মনে পড়িয়া যায়। বহু দিন হইতে সেগুলি আমার কাছে ধাঁধার মত হইয়া আছে।

মানুষ যখন একা থাকে, তখন তাহার হাবভাব আচার ব্যবহার যখনই লক্ষ্য করি, তখনই আমার মনে হয়, 'সে পাগল।'—এ ছাড়া আর কোনও কথাই আমি খুঁজিয়া পাই না।

সর্ব্বপ্রথম যখন ইহা লক্ষ্য করি তখন আমি নিতান্ত ছেলে মানুষ।......রঙেল ছিল জাতিতে ইংরেজ, ভাঁড়-সাজা ছিল তার পেশা। একদিন সার্কাসের অন্ধকার পরিত্যক্ত পথে পায়চারি করিতে করিতে সে মাথার টুপিটি খুলিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বার বার নিজেরই ছায়াকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিতে লাগিল। সেখানে তখন সে ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমি ছিলাম একটা ট্যাঙ্কে বসিয়া। আমাকেও সে দেখিতে পায় নাই। যখন সে গম্ভীর ভাবে বার বার মাথা নোয়াইতে লাগিল তখন আমি আমার মুখখানা বাহির করিলাম। রঙেলের এই আচরণ আমাকে অন্ধকার অস্বস্তিকর জল্পনা কল্পনার তরঙ্গে ফেলিয়া দিল।...সে ছিল ভাঁড়, তার উপর এমন ইংরাজ, যার পেশা বা কসরৎ—দুইই হইতেছে নিছক্ ক্ষ্যাপামির।

তারপর দেখিলাম, আমাদেরই প্রতিবেশী এ, শেকভ্—একদিন বাগানে বসিয়া টুপির মধ্যে সূর্য্যের আলো-কে বন্দী করিয়া, দুইটিই নিজের মাথার উপর বসাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। দেখিলাম তার নিজেরই ব্যর্থতা তাহাকে ক্ষুব্ধ করিতেছে; তার মুখ ক্রমশ লাল হইয়া উঠিতেছে; অবশেষে সে টুপিটি সজোরে হাঁটুর উপর ঝাড়িয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মাথার উপর তুলিয়া দিল, এবং নিতান্ত অধীরভাবে কুকুরটিকে দূরে ঠেলিয়া দিল। তারপর অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে আকাশের পানে মিট্ মিট্ করিয়া তাকাইতে তাকাইতে চুপি চুপি বাড়ীর দিকে চলিল। গেটের সামনে আমার সঙ্গে দেখা। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'গুড্ মর্ণিং। বেল্‌মন্টের কবিতা পড়েছ? 'সূর্য্যের গায় ঘাসের গন্ধ?' একদম বাজে কথা—না? রাশিয়ায় হচ্ছে কাজান্-সাবানের, আর এখানে তাতারের ঘামের—ব্যস্।'

এই শেকভ্‌ই একদিন বেশ সচেতন অবস্থায় একটা লাল মোটা পেন্সিল দিয়া একটি সরু ওষুধের শিশির গলায় অনবরত খোঁচা দিতেছিল,—ফলে বিজ্ঞানের বিধির সঙ্গে সঙ্গে শিশির মাথাটিও ভাঙিয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও কি তার বিশ্রাম আছে? 'এক্স্‌পেরিমেন্ট' সে করিবেই! বৈজ্ঞানিকের মত শান্ত অবিচলিত চিত্তে সে তার অসাধ্য-সাধনের কাজে লাগিয়া থাকে।

লিও টলষ্টয় একদিন একটা টিক্‌টিকিকে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "তুমি কি সুখী?"

টিক্‌টিকিটি তখন ভুল্‌বেরের পথে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে একটি পাথরের উপর রৌদ্র পোহাইতেছিল, আর টলষ্টয় চাম্‌ড়ার কোমরবন্ধে হাত দুটি পুরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তারপর সাবধানে চারিদিকে দেখিয়া লইয়া ঐ ক্ষুদ্র প্রাণীটির কাছে এই বিরাট মানুষটি অত্যন্ত চুপে চুপে নিজের অন্তরের গোপন কথাটি প্রকাশ করিলেন, "আমি কিন্তু নই।"

প্রফেসর টিক্‌ভিনস্কি একজন কেমিষ্ট। আমারই খাবার ঘরে বসিয়া চায়ের তামার ট্রে-টির উপর নিজের ছায়া দেখিয়া তাহারই উদ্দেশে বলিলেন, "বন্ধু, জীবনটা কি?"

ছায়া কোন জবাব দিলনা। কাজেই টিক্‌ভিনস্কি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাতের তেলো দিয়া যত্নভরে উহা মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রূ কুঁচকাইল। ভ্রূণ-হস্তীর শুঁড়ের মত নাকের ডগাটি কাঁপিতে লাগিল।

শুনিয়াছি কে একজন একবার এন্‌, এস, লেফ্‌কফ্‌কে দেখিয়াছিল;—তিনি আপন মনে টেবিলের ধারে বসিয়া খানিকটা তুলার পশম উপর-পানে ছুঁড়িয়া যাহাতে সেগুলি একটা চীনামাটির পাত্রের উপর আসিয়া পড়ে তাহার চেষ্টা করিতেছেন, আর যেই সেগুলি নীচে নামিতেছে অম্‌নি ঝুঁকিয়া পড়িয়া কান পাতিয়া শুনিতেছেন, কোনও শব্দ হয় কিনা! তাঁহার ধারণা, শব্দ নিশ্চয়ই হইবে।

পুরোহিত এফ্‌, ভ্লাডিমিরস্কি একবার তাঁর বুট-জোড়াটি সাম্‌নে রাখিয়া জোরে জোরে বলিয়াছিলেন,—

"এইবার—যা।"

তারপর—"উঁহু, পারিস্‌ না।"

পরক্ষণেই নিঃসন্দিগ্ধ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কহিলেন, "দেখলি! আমায় ছেড়ে তোদের কোথাও যাবার উপায় নেই।"

সেই সময় ঘরে ঢুকিয়া বলিলাম, "করছেন কি?"

আমার দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকাইয়া বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন, "এই বুট-জোড়া! গোড়ালি একদম্‌ খেয়ে গেছে। আজকাল কি বিশ্রী জুতোই না তৈরি করে মুচিরা!"

মানুষ যখন একা থাকে, তখন তারা আপন মনে কেমন হাসে, কেমন কাঁদে, ইহা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি।

একজন লেখকের কথা বলি।

ভদ্রলোকের কোনও দিন কোন নেশার খেয়াল ছিল না। মদ তিনি কোনও দিন স্পর্শ করেন নাই। কিন্তু একা থাকিলেই তিনি কাঁদিতেন, এবং ভাঙ্গা-পুরানো, ভায়োলিনের কর্কশ সুরে সেই একঘেঁয়ে গানখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কেবলই গাহিতেন, "একা যবে বাহির হলেম পথে—।" মেয়েদেরই মত—ভাল রকম শিষ দিতে তিনি

পারিতেন না। তাঁর ঠোঁট কাঁপিত। ধীরে ধীরে চোখ দিয়া জলের ধারা নামিত, ঘন ঘন গোঁফ-দাড়ির মধ্যে কোথায় তাহা হারাইয়া যাইত! একবার হোটেলের একটা ঘরে জানলার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রসারিত হাত দুটি সাঁতার-কাটিবার মত দুলাইয়া দুলাইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য ইহা ব্যায়াম নয়; হাত চালাইবার সে ধীর ভঙ্গির মধ্যে না আছে শক্তি, না আছে ছন্দ।

ইহাতে কিন্তু ততটা বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। হাসি ও অশ্রু মানুষের বিকৃত চিত্তের অস্বাভাবিক প্রকাশ কোনও মতেই নয়। ইহাতে কাহারও বিমূঢ় হইবার কথা নয়। বনে প্রান্তরে সমুদ্রে সমতল-প্রদেশে মানুষের নির্জ্জন নিশীথ-প্রার্থনায়ও চমকিত হইবার কিছুই নাই।

নিয়োগী-ডোরে থাকিতে আমারই এক প্রতিবেশী, —ভরোনোজ্ জেলার জমিদার তিনি—হঠাৎ এক রাত্রে অর্দ্ধনগ্ন ভাবে অথচ সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় ভুলিয়া আমার ঘরে আসিয়া পড়েন। তার আগেই আমি আলো নিবাইয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া ছিলাম। ঘরখানি চাঁদের আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে। মশারীর ছিদ্র দিয়া আমি তাঁর শুকনো মুখে কৌতূহলের মৃদু হাসিটি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম। তিনি আপন মনেই অনুচ্চকণ্ঠে নিজের সঙ্গে কথা কহিতেছেন—

"কে ওখানে?"

"আমি।"

"এটা তোমার ঘর নয়।"

"ওঃ—আমায় ক্ষমা করবেন।"

"দয়া করে—"

বলিয়াই তিনি চুপ করিলেন। ঘরের এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন। আয়নায় নিজের গোঁফ-জোড়াটির তারিফ্ করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে গাহিলেন,

"আমি ভুল পথে গিয়ে দিক্ হারালাম······

কেমন করে এ সম্ভব হল······কেমন করে?"

ইহার পরেও ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গেলেন না। একখানি বই তুলিয়া লইলেন। তারপর সেটি টেবিলের উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া রাস্তার দিকে তাকাইলেন। যেন কাহাকে বকিতেছেন, এম্‌নি ভাবে জোরে জোরে বলিলেন, "এখন দিনের মত আলো,—আর দিনের বেলায় যত অন্ধকার, যত ভয়! চমৎকার ব্যবস্থা—নয়?······"

এইবার পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়া প্রসারিত হাতে টাল্ সাম্‌লাইয়া সযত্নে ও নিঃশব্দে দরজাটি বন্ধ করিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কোনও একখানি বইয়ের পাতা হইতে আঙুল দিয়া ছবি উঠাইয়া লইবার চেষ্টায় নিরত শিশুর দৃষ্টান্ত সংসারে একেবারেই বিরল নয়। কিন্তু কোনও অধ্যাপক বা বৈজ্ঞানিককে ঐরূপ করিতে দেখিলে, এবং পাছে হাতে হাতে ধরা পড়িয়া যান এই ভয়ে উৎকর্ণ হইয়া চারিদিকে সশঙ্ক দৃষ্টি প্রেরণ করিতে দেখিলে, বেশ একটু বিস্মিত হইতে হয়।

একবার একটি অধ্যাপক ঠিক্ এম্‌নি করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁর নিঃসংশয় ধারণা ছিল যে কাগজের উপর হইতে ছাপা ছবি তুলিয়া ফেলা যায়, ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে তাহা বেমালুম গোপন করাও চলে। দু'একবার তাঁর মনে হইল, তিনি বুঝি সফলতা লাভ করিলেন! কাগজের উপর হইতে কি একটা যেন তুলিয়া লইয়া দুই আঙুলের ফাঁকে পয়সার মত করিয়া ধরিয়া পকেটে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; তারপর আবার আঙুলের দিকে তাকাইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, ছবিখানা আলোর পানে মেলিয়া ধরিলেন, এবং ছাপাটুকু তুলিয়া ফেলিবার জন্য ক্রমাগত ঘসিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে কোনও

ফল না পাইয়া, বইখানা ছুঁড়িয়া দিয়া, রাগে জোরে জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি বইখানা ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। এখানি জর্মান ভাষায় কোন একজন বিশেষজ্ঞের লেখা; বিভিন্ন ইলেক্‌ট্রিক্ মোটর ও তাহাদের অংশ বিশেষের ছবি ইহাতে আছে। কোনও ছবিই আটা দিয়া পাতার উপর আঁটা নয় এবং যাহা ছাপায় রহিয়াছে তাহা যে কোনও মতেই পাতা হইতে তুলিয়া লইয়া পকেটে ফেলা যায় না, ইহাত জানা কথা! অধ্যাপকও বোধ করি ইহা জানিতেন, যদিও কোনও বিশেষ বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানের ভাণ্ডারী তিনি ছিলেন না।

থিয়েটারের বারান্দায় আর একদিন একটি সুন্দরীকে দেখিয়াছিলাম। মাথা-ভরা চমৎকার কালো চুল। আসিতে তার সেদিন দেরী হইয়া গেছে—অভিনয় তখন আরম্ভ হইয়াছে। একখানি আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া চুলগুলি ঠিক করিয়া লইতে লইতে কাহার উদ্দেশে যেন বেশ একটু জোরে জোরে কঠোর কণ্ঠে বলিতেছে, "তবুও—মানুষকে মরতে হবে?"

বারান্দায় তখন আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না। আমারও আসিতে সেদিন দেরী হইয়াছিল। আমার দিকে সে ফিরিয়াও তাকাইল না। আর যদি বা তাকাইত তাহা হইলে বোধকরি আমাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ মর্ম্মান্তিক প্রশ্নটি করিবার কথা কখনোই ভাবিতে পারিত না।

একা বসিয়া 'পেশান্স্' খেলা খেলিতে খেলিতে অথবা প্রসাধনে ব্যস্ত থাকিয়া মেয়েরা ত অনেক সময় আপন মনে নিজের সঙ্গে কথা বলিয়া চলেই; তা ছাড়া, এক দিন একটি সুশিক্ষিত মেয়েকে নিরিবিলিতে খাবার খাইবার সময় দেখিয়াছিলাম, পুরা পাঁচটি মিনিট ধরিয়া একটা ছোট চিম্‌টা দিয়া এক একটি মিছ্‌রির দানা উপরে তুলিয়া ধরিয়া বলিতেছে,

"এই—তোকে খাব।"

সেটি খাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কাকে?"

"কেমন, খাইনি?"

গরমের সন্ধ্যা। পাঁচটা বাজিয়াছে। মেয়েটি জান্‌লার ধারে একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া আছে। বৃহৎ সহরের বিচিত্র গোলমাল পথ বাহিয়া আসিয়া ঘর-খানি ভরিয়া তুলিয়াছে। মেয়েটির মুখে চপলতার কোনও চিহ্ন নাই। তার ধূসর চক্ষের নিবিড় দৃষ্টি কোলের উপরকার মিঠাইয়ের বাক্সটির প্রতি একান্ত ভাবে নিবদ্ধ।

বাস্তবিক, মানুষ যখন একা থাকে তখন অনেকেই এম্‌নি ধারা অদ্ভুত আচরণ করে। এখানে আরও একটি দৃষ্টান্ত দিই।

এলেক্‌জেণ্ডার ব্লক্ একদিন একটি সাধারণ পাঠাগারের সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া পেন্সিল দিয়া বইয়ের ধারে ধারে কি লিখিতেছিলেন, হঠাৎ সসম্ভ্রমে কাহাকে যেন পথ দিয়া নিজে থাম ঘেঁসিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাকে বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে ছিলাম। দেখিলাম, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গেল না......একদম উপরে, সিঁড়ি উঠিয়া গিয়া যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম; সেই কল্পিত আগন্তুকের অনুসরণ করিতে যাইয়া ব্লকের সস্মিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। আমার দৃষ্টিতে বোধ করি বিস্ময় ছিল—হাত হইতে তাঁর পেন্সিলটি পড়িয়া গেল, সেটি কুড়াইবার জন্য নত হইলেন,—এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আমার আস্‌তে কি দেরী হয়েছে?"

অনুবাদক—মুরলীধর বসু

কাণের ফুল

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

নয়নতারা যখন বিধবা হইল তখন তাহার বয়স বত্রিশ পার হইয়াছে।

একটি শিশুপুত্র এবং দুই বিধবা-কন্যা লইয়া জীবনের নূতনতর কর্ত্তব্যে সে এমন কোমর বাঁধিয়া হুঁসিয়ারির সহিত নামিল যে জ্ঞাতি-প্রতিবেশীদের আর বিস্ময়ের শেষ রহিল না।

তাহার স্বামী অল্পদিন ওকালতি করিয়া বিশেষ কিছু জমাইতে না পারিলেও মৃত্যুর পর স্ত্রীপুত্রকন্যা কষ্ট না পায় ভাবিয়া একটা অসমসাহসের কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত অবস্থার লোক—বিশ-হাজার টাকার লাইফ-ইনসিওর করা সহজ ব্যাপার নহে!

এই দুঃসাহসিকতার জন্য স্বামীর জীবদ্দশায় বহু দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করিয়া নয়নতারা কিন্তু একদিন বুঝিয়াছিল যে চন্দ্রমোহনের একটা পাকা আখেরি বুদ্ধি ছিল।

কন্যা দুইটির সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু চিন্তা করিবার ছিল না; তাহাদের মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন জোগাইতে পারিলে তাহার পরিবর্ত্তে তাহারাই সংসারটিকে চালাইয়া লইবার পথ সুগম করিয়া দিবে।

তাই পুত্র বিশ্ববন্ধুর ভবিষ্যতের প্রতি তাহার একান্ত প্রখর দৃষ্টি অনুক্ষণ নিবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহাকে পাঁচের আরম্ভেই যথাসাধ্য সমারোহের সহিত হাতে-খড়ি সমাধা করিয়া একজন বৃদ্ধ বিজ্ঞ মাষ্টারের জিম্মায় দিয়াও কিন্তু নয়নতারার মন একদিনের জন্যও নিশ্চিন্ত হইল না।

ভোরের বেলা পুত্রকে নিদ্রা হইতে ডাকা-ডাকি করিয়া তুলিয়া পাঠে বসান এবং মাষ্টার আসিলে পাশের ঘরে বসিয়া কেহ ফাঁকি না দেয়, তাহার রীতিমত তদ্বির ঘড়ি ধরিয়া করিতে নয়নতারার একটি দিনের জন্যও আলস্য হইত না।

কোনদিন আসিতে দেরি হইলে—মাষ্টারকে বাড়ীতে লোক দিয়া ডাকিয়া পাঠান, এবং নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে কোনদিন তিনি চলিয়া গেলে, পরের দিন উমাকে দিয়া তাহার কঠিন কৈফিয়ৎ তলব করা, তাহার একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

২

সে-মাসে মাষ্টার-মশাই তাঁহার পুত্রের অসুখের জন্য দিন-তিনেক আসিতে পারেন নাই এবং হয়ত' পাঁচ ছয় দিন দেরি করিয়া আসিয়া সময়ের পূর্ব্বেই শীঘ্র-শীঘ্র চলিয়া গিয়াছিলেন। পরের মাসের পয়লা তারিখে অনেক যোগ-বিয়োগ করিয়া বহু তর্ক-বিতর্কের পর, নয়নতারা চারি দিনের পূর্ণ বেতন কাটিয়া একটুকরা কাগজে "৮ দিনের অর্দ্ধ বেতন কাটা গেল" লিখিয়া উমার হাতে টাকাটি পাঠাইয়া দিয়া পাশের ঘরে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল—দেখি, কি বলেন মাষ্টারমশাই!

মাষ্টার-মশাই কিছুই বলিলেন না। কেবল একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে দরিদ্রের সকল ব্যথার নিষ্ফল নিবেদন নিঃশেষ করিয়া দিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন!

হঠাৎ নয়নতারা মনের মধ্যে কেমন-যেন-একটা অসাধারণ উষ্মা বোধ করিল। হঠাৎ ফণা তুলিয়া তাহার মন বলিল, ইস্ এত অহঙ্কার! একবার মুখ ফুটে বিনয় ক'রে বল্‌তে কি হয়েছিল?—হাজার হলেও আমিত মুনিব! কি হয়েছিল বল্‌তে?—কেমন করে চলে আমার টাকা কটা কাটা গেলে? সত্যি কি আমি মানুষের দুঃখ বুঝিনে, না দয়া করতে জানিনে!

পরদিন প্রাতে বিশ্ববন্ধু পাঠে বসিল; কিন্তু মাষ্টারের দেখা নাই।

নয়নতারা যেন এক নিঃশ্বাসে আগা-গোড়া সকল ব্যাপার বুঝিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্জ্জয় রাগে মনটা তাহার মোচড় খাইতে লাগিল। সে মনে-মনে বলিল, বেশ, চাকুরি ছাড়ার মতলবখানা কাল যাবার সময় পষ্টো করে বলে যেতে কি হয়েছিল? সমস্ত দিনের মধ্যে একটা কোন উপায় ক'রে নিতে সত্যাই কি আমি পারতুম না? দেশে কি মাষ্টার পাওয়া যায় না?

চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, মাষ্টারবাবু 'বড়ি বিহানে' উঠে বেরিয়ে গেছেন; উষা দিদি জানেনা কোথায় গেছেন তিনি......

চুলোয় গেছে। নয়নতারার রাগ কিছুমাত্র প্রশমিত হইল না। এঘর-ওঘর করিতে করিতে সে আপন মনে বকবক করিতে লাগিল, বুড়ো—লুভি! সেদিন থেকেই জানি—সদরালা-গিন্নীর নজর পড়েছে—"বুড়ো পুরোণো লোকটা"—দেখি রাখ্না তোরা কদিন পারিস্ মাথায় ক'রে—আজ বাদে কালত' যাবি বদলি হ'য়ে—তার পর?......

কিন্তু বিশ্ববন্ধুর পড়ার কি হয়? জীবনের একদিন কেন এক তিলও কি অবহেলার? এমন করিয়া ঢিল্ দিলে ছেলে একটা আখাম্বা-আকাট-মূর্খ তৈয়ারি হইয়া উঠিবে! কি হইবে বয়াটে মূর্খকে লইয়া? কয়দিন ঐ ক'টা টাকা!—কতক্ষণের জন্য?......

উত্তপ্ত কটাহে জীবন্ত খলিসা মাছের মত নয়নতারা চারিদিকে ছটফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একবার ভাবিল—কাজ নাই, মাষ্টারকে না হয় টাকাটা পাঠাইয়া দেয়; কিন্তু সেইক্ষণেই আবার মনে হইল, বাপ্‌রে! বিধবার টাকা! একবার নরম পেলেই চারদিকের চাপে কর্পূরের মত কোথায় উড়ে যাবে! নাঃ অত বোকা আমি নই!

৩

চন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর বাড়ীর পশ্চিমদিকের রান্না ভাঁড়ারের ঘরগুলা তফাৎ করিয়া নয়নতারা উঠানের মধ্যে একটা পাঁচিল তুলিয়া দিয়াছিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত, স্থষ্যি-বেদি উঠোনে, কি ভাল হলো? খুদ-কুঁড়ো নিয়ে সংসার, দেবতারা যা' চান্ না—রাখ্‌তেও ভয় করে; হোক্ না সে কর্ত্তার হাতেরই করা!

কিন্তু ধীরে ধীরে সেই অংশে মাসিক সাড়ে পাঁচ টাকায় ভাড়াটিয়া বসিয়া গেল! সবাই বলিল, সাবাস বুদ্ধি বিধবার! এ যেন রথ দেখিতে গিয়া কলা বেচিয়া আসা!

এই বাড়িটিতে মোক্তার হারাধন গাঙ্গুলি মাস চারেক বাস করিতেছিল।

হারাধনের অনেকগুণ, বিশেষ করিয়া ভারি মুখ-মিষ্ট; কিন্তু প্রকাণ্ড দোষ যে ইহারই মধ্যে তিন মাসের ভাড়া বাকি ফেলিয়াছে। হারাধন কিন্তু সেকেলে ছাত্রবৃত্তি পাশ করা অগা মোক্তার নয়;—বলিয়ে-কইয়ে একটা-পাশ-করা ইংরাজি-জানা চালাক-মোক্তার। আশা ছিল যে একদিন তাহার পসার জমিবে।

ছট্‌ফট্ করিয়া এদিক-ওদিক করিতে করিতে নয়নতারার মাথায় সেদিন বিদ্যুতের মত একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল,—হারাধনকে মাষ্টার রাখ্‌লে কি হয়? ভাড়ার টাকাও বাকি পড়ে না—আর পুত্রের জীবনের এই অমূল্য মুহূর্ত্ত গুলো বৃথা ব'য়ে যেতে পারে না।

কথাটা কিন্তু হঠাৎ ফাঁস হইবার আশঙ্কায় মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া নয়নতারা সোজা খিড়কির দরজা খুলিয়া হাঁক্ পাড়িল, বৌ ও বৌ, বলি, হারাধন কি বাড়ীতেই?

হারাধন বেচারির বাড়িতে তখনো মক্কেল আসিত না। কাজেই সে সকাল-সকাল আহার সারিয়া, আদালত বসিবার বহু পূর্ব্বেই—কাছারি বাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণের বটতলায় সার্কাসের ঘোড়ার মত চক্কর দিত।

কিন্তু সাত-সকালে আহার করিতে হইলে দাসী রাঁধুনীর একত্র সমাবেশ অল্প বয়সের স্ত্রীর উপর নির্ভর করিলে কাঁচা ভাত খাইয়া মেজাজ খারাপ করিতে করিতে

আদালত যাইতে হয়। তাই বুদ্ধিমানের মত হারাধন, সকালের দিকটায় আইনের চর্চ্চা না করিয়া পূর্ব্ব-পুরুষানুসৃত জাতি ব্যবসার অনুশীলন করিতে রন্ধনশালায় যাপন করিত।

অসময়ে কর্ত্রীর হুঙ্কার শুনিয়া হারাধনের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চক্ষু পরিষ্কার করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া বলিল, কি বল্ছেন, মা?

নয়নতারা চেষ্টা করিয়াও মানসিক উত্তেজনার সবটা চাপিতে পারে নাই। তাই হারাধন মনে মনে প্রমাদ গণিল এবং কণ্ঠটি যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিল, কেন মা?

নয়নতারা কহিল, বলি বাছা, তিন মাস পেরিয়ে চার মাসে প'ড়লো, বাড়ির ভাড়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেকগুলি হ'য়ে জমে উঠ্‌লো; আর বিধবারই বা চলে কেমন করে...

হারাধন জানিত যে বলিবার অবসর দিলে কর্ত্রীর মুখ হইতে অনেক-কিছু কটু-কাটব্য নিঃসৃত হইয়া আসিবে—তাই তাড়াতাড়ি তাঁহার কথার গতিরোধ করিয়া বলিল, মা, যদি আমি এক মায়ের ছেলে হই......কি বলচি, ভুলেও মিথ্যে বল্‌বো না......এই টাকার জন্যে, সত্যি বল্‌চি মা, খেতে মুখে রোচে না, রেতে শুয়ে দু'চখে এক তিল ঘুম নেই, মা। কি করবো বলুন, বিল দিয়েছি—আজ তিন মাস......জমিদারি সেরেস্তা বেটাদের আঠারো মাসে বচ্ছর কি না! তা' মা আপনার চরণ ধরে বল্‌চি, আজ আবার পাটওয়ারির হাতে ধরে বলবো।

নয়নতারা বলিল, ও কথা ত' বাছা—সেই নাগাদ সুরু থেকেই শুন্‌ছি—এই ক'মাসে বোধ করি তেত্রিশ বার শুনলুম। একটা উপায় ত করা চাই! তোমাদের ত' বোঝা উচিত বাপু,—যে এই টাকা নেড়ে-চেড়ে আমাদের দিন চলে!—শেষ পর্য্যন্ত কি আমরা না খেয়ে থাকবো?......আর অন্যের বাকি রাখ্‌লে একদিনও চলে না!—এই দেখ না মাস যেতে-না-যেতে মাষ্টারকে তো কড়ায়-ক্রান্তিতে তার পাওনাটি গুণে দিতে হলো!

হারাধন ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, সে কথা একশ'বার সত্যি মা! আপনি যা হুকুম করেন, তাই ক'রবো।—না হয় বৌএর ফুল দুটো বেচে ফেলি, বলেন ত?

নয়নতারা এবারে একটু ঝাঁঝাইয়া উঠিয়া বলিল, তাই বা আমি ব'লতে যাব কেন? কপালের দোষে এ-জন্মেত রাঁড়ি হয়েছি,—আবার এয়োস্তিরির গয়না বেচিয়ে—আস্‌চে জন্মের আশাটুকুও খুইয়ে বসবো?

হারাধন অপ্রতিভ ভ্যাবা-গঙ্গারামের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—না—না......

নয়নতারার বক্তৃতা এদিকে ছল্ ছল্ গতিতে বহিয়া চলিল, আর এও ত' বাপু তোমাদের বিচ্ছিরী অন্যায়, তোমাদের নিজের—দু' হাত পা থাক্‌তে—একটিবার তার কথা মনে পড়ে না—সব্বারির আগে ঐ কচি বৌটার গায়ের গয়না বেচার কথা কি ছাই মনে আসে?

আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া হারাধন বলিল, কি করি মা, উপায় না দেখ্‌তে পেয়ে দিশেহারা হ'য়ে ওকথা ব'লেছি, মাপ কর্‌বেন।

বাসন মাজিতে মাজিতে সুরবালা নয়নতারার দিকে সকৃতজ্ঞ-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিল, উনি বোধ হয় আর জন্মে আমার মা ছিলেন।

নয়নতারা বলিল, কিন্তু পুরুষ মানুষের এমন কথায়-কথায় দিশে-হারা হ'লেই বা চ'ল্‌বে কেন? তুমি ত' আর মুখ্‌খু সুখ্‌খু নও; এই সকাল বেলা মেয়ে মানুষের পিছনে-পিছনে না ফিরে—সত্যিই কি একটা ছেলে পড়ান খুঁজে নিতে পার না?

হারাধন কর্ত্রীর শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যে অকস্মাৎ ভুলিয়া গেল যে কেনই বা সে স্ত্রীর পিছনে ফেরে। লজ্জিত হইয়া সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, তাই বা কে দিচ্ছে, মা?

নয়নতারা প্রায় ধমক দিয়া বলিল, খুঁজে কোনদিন দেখেছ কি? কেন—তুমি যদি দুবেলা একটু-আধটু ক'রে বিশুটাকে নিয়ে বোস তো—আমি চাইনি তোমার কাছে বাড়ির ভাড়া। বুঝবো যে একজন গরীব বামুনের উপর দয়াই কর্‌লুম।

হারাধন নিরুপায় বুঝিয়া তাহাতেই রাজি হইয়া গেল।

সুরবালা তাহার কাণের ফুল দুইটির আশু-রক্ষার কথা চিন্তা করিয়া সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

৪

বিশ্ববন্ধুর মাষ্টার মশাই রাজেন্দ্র ঘোষালের অনেক বয়স হইয়াছিল।

মাষ্টারিতে একদিন তাঁহার ভালই নাম ছিল। তিনি কবি বায়রণের কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন, এবং বার্কের এমেরিকান ট্যাক্সেশন, তাঁহার আগা-গোড়া মুখস্থ ছিল।

কিন্তু এই সমুহ-পরিবর্ত্তনশীল সংসারে পাণ্ডিত্যের মাপ-কাঠির নিত্য বদল হইতেছে! হঠাৎ একদিনে বার্ক-বায়রণ একদম বাতিল হইয়া গেল!

নবাগত খিট্‌-খিটে-মেজাজ বি টি হেডমাষ্টারটি "আর্ট অভ টিচিং" এর উপর এমন বেতর জোর দিয়া বসিলেন—যে ঘোষাল মহাশয়ের মা-সরস্বতী আর কিছুতেই হালে পানি পাইলেন না!

তাহার উপর—তিনি ক্লাশে মারধোর একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন; ছেলেদের মঞ্চে খাড়া করিলে কৈফিয়ৎ তলব করেন! আরো উৎপাত। একটা মন্তব্যের খাতা খুলিয়া এমন সকল কঠিন ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন যাহাতে বোঝা গেল যে বৃদ্ধের চাকুরির আয়ু প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

তবুও লোকে মনে করিত যে চল্লিশ বছরের বুড়া-বটের অনেক শিকড়, ফুৎকারে উড়িয়া যাইবার নহে!

সেদিন নয়নতারার বাড়ি হইতে ফিরিয়া বৃদ্ধের যেন কি হইল। ঊষা বার বার তাগিদ দেয়, বাবা, তোমার যে দেরি হ'য়ে যায়। কিন্তু বাবা তেল মাখিয়া হুঁকা খাইতে খাইতে কেবলই ঘুমাইয়া পড়েন।

ফলে নাকে মুখে গুঁজিয়া খাইয়া হন্ত-দন্ত করিয়া ছুটিতে ছুটিতে স্কুলে পৌঁছিয়া দেখিলেন, হাজ্‌রি বহিতে তাঁহার নাম-সহির স্থানে বড় কর্ত্তার লাল কালির ঢেরা পড়িয়া গেছে!

চাকুরি-জীবনে এতবড় অপমানের শেল ঘোষাল মশাইএর বুকে বোধ করি এই প্রথম। কাজ করিয়াও সে-দিনের বেতন পাইবেন না, উপস্থিত থাকিয়াও অনুপস্থিত গণ্য হইবেন! এত বড় অসত্যের জবরদস্তি, তাঁহার মনটাকে তিক্ততায় পূর্ণ করিয়া দিল! দুই চক্ষু লঙ্কা ঘষিয়া দেওয়ার মত জ্বালা করিয়া মাথা-টিপ্‌টিপ্‌, গা-শির্‌-শির্‌ করিয়া শরীরটা একেবারে বে-এক্কার হইয়া পড়িল।

রাগে অভিমানে ঘোষাল মশাইএর মনটাও কেমন বেতালা হইয়া গেল—তিনি একখানা কাগজে, শরীর-অসুস্থতার অজুহাতে বাড়ী চলিলেন—লিখিয়া দিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথাকালে, ভরা-সন্ধ্যার সময় ব্যাপ্রের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল; একখানা লম্বা মোড়কের মধ্যে জরুরী চিঠি!

স্কুলের সম্পাদক জানাইয়াছেন :—

যেহেতু স্কুলের স্বার্থে তোমাকে, তোমার কাজের হিসাবে আমরা, অতি বৃদ্ধ এবং একান্ত অপটু বিবেচনা করিতেছি, অতএব অনুরোধ করি যে আগামী কল্য হইতে স্কুলে না আসিয়া বাধিত করিবে।

এই পত্র প্রাপ্তির পর—আইনতঃ তোমার যাহা কিছু পাওনা হইবে—তাহা হিসাব করিয়া তোমাকে দিবার আদেশ, যথাযোগ্য ব্যক্তিকে করিলাম।

চিঠি পাইয়া তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল; বিছানায় শুইয়া সমস্ত রাত্রি এপাশ-ওপাশ করিয়া বিনিদ্রায় কাটিয়া গেল।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি সেক্রেটারির বাড়ী রওনা হইয়া গেলেন।

আশা ছিল—হাতে পায়ে ধরিলে হয়ত আরো ছয় মাসের সময় পাইতে পারেন!

পথ অতিক্রম করিতে করিতে কি বলা উচিত এবং অনুচিত তাহা মনে মনে সাজাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে নানা তর্ক জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় তাহাদের খেই কিছুতেই ভাবিয়া বাহির করিতে পারেন না!

মনে হইল, ছয় মাসের সময় প্রার্থনা কোন প্রকারে অযৌক্তিক হইবে না, কেন না—

প্রথমতঃ—উষার বিবাহের ঋণ পরিশোধ করিতে তখনো বাকি ছিল—একশত।

দ্বিতীয়তঃ—স্ত্রীর অসুখের দরুণ ঔষধের দোকানে দেনা জমিয়াছিল মোবলক, পঁইষট্টি।

অবশ্য—উষা তাহার পর বিধবা হইয়াছে এবং স্ত্রীও দেড় বৎসর ভুগিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

তাহাতে কি?—কোন্ মহাজন এই অজুহাতে ঋণ মাফ্ করে?

এবং কেমন করিয়াই বা তিনি সেই অনুরোধ তাহাদের করিতে যাইবেন?

অতএব প্রমাণ হইল যে তাঁহার আরো ছয় মাসের সময় পাওয়া একান্ত আবশ্যক।

বিহ্বলতায় অধীর হইয়া বৃদ্ধ বিপর্য্যস্তভাবে এই সব চিন্তা করিয়া কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছিলেন না। একবার আশা হইতেছিল, গুছাইয়া জুৎ-মত করিয়া বলিতে পারিলে হয়ত রায় বাহাদুরের দয়া হইতে পারে। পরক্ষণেই কালো মেঘের মত নিরাশা তাঁহার মনের দিগদিগন্ত ছাইয়া দিতেছিল।

রায় বাহাদুরের গৃহে প্রবেশ করিয়াই কিন্তু সকল আশা সহসা চুরমার হইয়া গেল। রায় বাহাদুরের পার্শ্বে হেড মাষ্টার খাড়া হইয়া বসিয়া ছিলেন।

তবুও ঘোষাল মশাই কিছুই ত্রুটি রাখিলেন না, দুইকর জোড় করিয়া বলিলেন, আজ আপনারা যুগলে দয়া করুন.........

টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সস্মিতবদনে, বিদ্রূপ-কঠোরকণ্ঠে রায় বাহাদুর বলিলেন, দয়া বুঝেছেন কিনা, ঘোষাল মশাই?—অনেক দেখান হয়েছে,—এতদিন; আর কিছুতেই চলবে না। আপনাকে রাখলে হেড মাষ্টার বলেন ইস্কুল উঠে যাবে।

কম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, এই চল্লিশ বছোর—কণ্ঠে ধ্বনি বদ্ধ হইয়া গেল, জল-ভারাবনত দুই চক্ষু বুজিয়া তিনি শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে স্পষ্টাক্ষরে শুনিতে পাইলেন অতি কর্কশকণ্ঠে হেড মাষ্টার বলিতেছেন—হিপক্রীট—প্রকাণ্ড ভণ্ড।

৫

পরদিন প্রাতে নয়নতারা বিশ্ববন্ধু এবং তাহার নূতন মাষ্টারকে লইয়া কঠিন পাহারা দিতেছিল।

চির-অনভ্যস্ত কাজে হারাধনের মন যেন কিছুতেই বসে না! একবার করিয়া সে পলায়নোন্মত মনটিকে ধর-পাকড় করিয়া নূতন কর্ত্তব্যের মধ্যে টানিয়া আনে—আবার কখন কোন্ ফাঁকে তাহা ছুটিয়া সুরবালার কাছে উপস্থিত হয়। কেমন করিয়া একাকী নয়টার মধ্যে রান্না শেষ করিতে সে পারিয়া উঠিবে? অতএব আজ এই হইতেই বেণী মোক্তারের পোয়াবার-তের। এই কথা ভাবিয়া তাহার সমূহ চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিতেছিল।

এদিকে পুরাতন মাষ্টারের অভাবে বিশ্ববন্ধুর যেন সবই ফাঁকা ঠেকে! তাহার উপর, নয়নতারা তখন থাকিত নেপথ্যে—এত কাছাকাছিতেও সে যেন সমূহ অস্বস্তি বোধ করিল।

হারাধন কিছু গুরুগম্ভীরচালেই কাজ সুরু করিয়াছিল—তাই বিশ্ববন্ধুর কেমন ভয়-ভয় করিতেছিল; যেন কিছুতেই এই মাষ্টারকে খুশী করিতে পারা যায় না।

তাহার হাতের লেখার খাতা দেখিয়া সে-মাষ্টার বলিতেন, বাঃ বাঃ কি চমৎকার! কি সুন্দর! তাই সে তাড়াতাড়ি সেই খাতাখানি খুলিয়া ধরিয়া প্রশংসার প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল।

হারাধনের কিন্তু বাঁকা-চোরা থগাবগা অক্ষর দেখিয়া পিত্ত চটিয়া গেল। পাতাখানির একদিক হইতে অপর-দিক পর্য্যন্ত লাল-কালির "ঘ্যাচ" টানিয়া দিয়া, ধমক দিয়া বলিল, এ কিছু হয়নি—আবার লিখে আন্।

ভয়ে বিশ্ববন্ধুর তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল।

নূতন শিক্ষকের রাশ-ভারি তর্জ্জন-গর্জ্জনে কিন্তু নয়নতারা অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিয়াছিল। এমন

াক ডাক নহিলে মাষ্টার! যেন বনের আস্ত জীবন্ত বাঘটি! প্রসন্নচিত্তে সে তুলনা করিয়া দেখিতেছিল, ইস্ কি ভালই হয়েছে—কোথায় পনর টাকায়—মাত্র এক বেলা; আর সাড়ে পাঁচে দু-বেলা! ইস্ কি ভালই হয়েছে—নিজের বুদ্ধির সে অনেক তারিফ্ করিল। খুসীতে তাহার মনটি ভরিয়া উঠিল—এবং চক্ষু দুইটা ঝক্-ঝক্ করিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে বাহির হইতে ক্ষীণকম্পিতকণ্ঠে ডাক শুনা গেল,—বিশ্ববন্ধু, বিশু বাবু...

বালক লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, ওই আমার ভালো মাষ্টার—ওর কাছে আমি পড়বো।

সে ছুটিয়া গিয়া ঘোষাল মশাইএর কাপড় ধরিয়া সাগ্রহে আহ্বান করিল, এসো, এসো; এদিকে...

অবোধ বালকের নির্ব্বুদ্ধিতায় এত বড় কায়েমি বন্দোবস্তটা বুঝি বা উল্টাইয়া যায়—মনে করিয়া নয়নতারা অতিমাত্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া তীব্র চীৎকার করিয়া বলিল, হারাধন, ওঁকে যেতে বল, কাজ নেই আমার ওঁকে দিয়ে। জান্‌না উনি সদরালাদের ছেলে পড়াতে।—বলে দাও, ওঁকে আমার আর কোন দরকার নেই—হারাধন, ওঁকে যেতে বল—ওঁকে কোন দরকার নেই......

অবাক হইয়া ঘোষাল মশাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, বেশ ব্যস্ত হবেন না, আমি যাচ্চি।

পথের বাহির হইয়া পা-দুইখানা তাঁহার কিছুতেই আর বশ মানে না। কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিবার সময় কোথায়? তাঁহার চক্ষের সম্মুখে হঠাৎ একটা অন্ধকারের আচ্ছাদন নামিয়া আসিল।

তিনি অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন—তাইতো কোন্ দিকে যাই? কিন্তু দাঁড়ানও যায় না—তখনো যেন পিছন হইতে বলিতেছে—ওঁকে যেতে বল, ওঁকে যেতে বল—কাজ নেই, ওঁকে যেতে বল...

কালো পর্দ্দাটা দুই হাত দিয়া সরাইবার সময় অলক্ষ্যে নিজের চক্ষের জলের স্পর্শ অনুভব করিয়া বলিলেন,—এ যে জল! নদী নাকি?

নদী?

মনে হইল হয়ত ইহার পর-পারে কত চেনাপরিচিত লোক—তাঁহাকে ডাকিয়া লইতে বসিয়া আছে!

তখন একটি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! বৃদ্ধ দুই চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায়—ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন :—

মাঝি! মাঝি! আর দেরি করিস্‌নে—মাঝি! মাঝি! নৌকা আন্—!

৬

বহুলোক ধরাধরি করিয়া ঘোষাল মশাইকে যখন গৃহে আনিল—তখন আর কিছুমাত্র জ্ঞান চৈতন্য নাই।

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া অরুণ ডাক্তার বলিল, দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় মাথার ভেতরের শির ছিঁড়ে গেছে। অনবরত বরফ দেওয়া ছাড়া আর কিছু উপায় নেই।

ঊষা টাকার ছোট ব্যাগটি খুলিয়া দেখিল, তাহাতে আছে মাত্র কয়েকটি পয়সা।

বাহিরে আসিয়া দেখিল, ভিড় সরিয়া গেছে—কেবল ও-বাড়ির নিতাই একখানা পাখা লইয়া সজোরে ঘোষাল মশাইএর মাথায় বাতাস দিতেছে।

সে বাষ্প-জড়িত স্বরে বলিল, নিতাই দাদা, বরফ এনে দিতে হবে যে!

নিতাই বলিল, দেবো; কিন্তু তুই কি একলা থাকতে পারবি?

ঊষা এতক্ষণ যেন ব্যাপারটা ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। নিতাইএর কথায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া গেল—তবে কি বাবা আর বাঁচবেন না? তাহার কান্না আর কিছুতেই থামিতে চায় না।

নিজেকে সম্বরণ করিয়া নিতাই বলিল, ছিঃ ঊষা, কাঁদিস্ নে। বিপদের সময় অধীর হ'স্‌নে বোন্। তুই এমন ক'রলে কে জেঠা-মশাইকে সেবা ক'রবে? তোর সেবাতেই উনি ভাল হ'য়ে উঠবেন যে, ভাই।

চক্ষু মুছিয়া ঊষা বলিল, তবে আর আমি কাঁদবো

না নিতাইদাদা, তুমি একটু বোসো আমি মনের কথাকে ডেকে আনি গে।

ক্ষিপ্রপদে সে বাহির হইয়া গেল।

হারাধন আদালতে চলিয়া যাওয়ার পর সুরবালা খাইয়া মুখ ধুইতেছিল। উষা ছুটিয়া গিয়া বলিল, মনের কথা! শীগগীর দুটো টাকা দে—আর আমাদের বাড়ি চল্; বাবার বড় অসুখ করেছে ভাই,—তাঁর মাথায় বরফ দিতে হবে।

সুরবালা আকাশ হইতে পড়িল, বলিস্ কি? সে কি লো, এইতো তাঁকে দেখলুম্ রাস্তা দিয়ে আস্তে-আস্তে বাড়ি যাচ্চেন। কখন অসুখ হলো?

উষা বলিল, পথেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন। অরুণদাদা বল্লেন, ভাবনায় ভাবনায় মাথার ভেতরের শির ছিঁড়ে গেছে।

সুরবালা বাক্স পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল, মনের কথা ভাই—টাকা যে একটিও পাইনে।

নেই? উষার গৌর মুখখানি সহসা কালো হইয়া গেল,—কি হবে ভাই! বাবা কেমন ক'রে বাঁচবেন? নিতাই দাদা ব'সে আছেন, আমরা গেলে বরফ এনে দেবেন।

সুরবালা নিবিড়ভাবে চকিতে কি যেন ভাবিয়া লইল—তাহার পর কাণের একটি পাথর বসান দুল খুলিয়া বলিল, ভয় কি মনের কথা! টাকার জন্যে ভাবনা নেই! চল্, আর দেরী ক'রে কাজ নেই ভাই।

উষা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, ওকি, তুই কাণের দুল দিবি?

দেব না ত কি? বাবার চাইতে কি কাণের দুলটা বড়, মনের কথা?

—বঙ্গবাণী, আশ্বিন, ১৩৩৩

'সৃষ্টির আদিতে'

Before the Beginning of Years

(সুইনবার্ণ)

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

হ'ল যবে আয়োজন—
সৃষ্টির আদিতে,
মানুষের মর্ম্মের
ছাঁচখানি বাঁধিতে—
মহাকাল নিয়ে এল
অশ্রুর ভর্‌না,
চিরসাথী হইবারে
দুখ দিল ধর্‌না;

সুখ,—তার স্বাদ নাই
বেদনার বিহনে,
মধুমাস নিয়ে এল
ঝরাফুল পিছনে;
স্বর্গেরি স্মৃতি—কিবা
সুন্দর ধারণা!
—অন্তরে উন্মাদ,
নরকের তাড়না!

বল,—তার বাহু নাই
ধরিবারে প্রহরণ,
প্রণয়ের পুলকেতে
পলকেরি শিহরণ।
দিবসেরি ছায়া—সেই
নিশীথের নীলরূপ,
জীবনের হাসিমুখে
মৃত্যুরি বিদ্রূপ।

দেবতারা নিল তাই
আগুনের ফুল্‌কি,
আর জল,—কপোলের
ধারা সেই, ভুল কি?
ধেয়ে চলে ঋতু-মাস—
ঝরে বালি পা'য় পা'য়,
নিল তুলি' ত্বরা করি
তার দুই কণিকায়;
সিন্ধুর ফেনা নিল—
ভেসে আসে যেই সব,
আর নিল মেদিনীর
শ্রম-ধূলি বৈভব।
জন্ম ও মৃত্যুর
ভাবী উৎসঙ্গে
যত আছে রূপ-রাগ—
নিল সেই সঙ্গে।
সব সাথে মাখি' লয়ে
হাসি আর ক্রন্দন,
বিদ্বেষ-পঙ্ক ও
প্রীতিঘন চন্দন,
সাম্‌নে ও পিছে ধরি'
জীবনের ডঙ্কা,
ঊর্দ্ধে ও মহীতলে
মৃত্যুর শঙ্কা,—
শুধু একদিন আর
একটি সে রাত-ভোর
গাঁথিবারে শক্তি ও
ফূর্ত্তির ফুল-ডোর,
দিয়ে দুখ নিদারুণ—
পাষাণের ভার তায়,
গড়ি' দিল সুমহান্
মানবের আত্মায়।

ভরি' দিক্ আর দিক্-অন্ত
ধায় তারা যেন মহা দ্বন্দ্বে,
দেহ তার করে প্রাণবন্ত
ফুৎকারি' মুখে, নাসারন্ধ্রে।
দিল ভাষা, আর দিল দৃষ্টি—
অপরের অন্তর ছলিতে,
হ'ল কাজ অকাজের সৃষ্টি,
আর পাপ,—তাপে তার জ্বলিতে।
দিল দীপ হরি' পথ-ভ্রান্তি,
দিল প্রেম, প্রমোদের পর্ব্ব,
আর নিশা, নিশীথের শান্তি,
পরমায়ু, আর রূপ-গর্ব্ব।
বাণী তার জ্বালাময় বিদ্যুৎ,
দু'অধরে প্রকাশের বেদনা,
কামনা যে অন্ধ ও অদ্ভুত!
চোখে তার মরণের চেতনা!

রচে বাস—তবু চিরনগ্ন,
দেহ ঢাকে ঘৃণারই সে বসনে,
বোনে বীজ—ফসলের লগ্ন
ব্যর্থ যে, ভাগ নাই অশনে।

ঢুলে' ঢুলে' স্বপ্নে ও তন্দ্রায়
তার সারা আয়ু যায় ফুরায়ে,
ঘুম থেকে জেগে ফের ঘুম যায়,
জীবনের জ্বর যায় জুড়ায়ে।

বান-ভাসি

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

একটা পা থাকে কাঠের উপর আর এক পা মাটিতে। সুমুখের দিকে ঝুঁকিয়া অবিনাশ দুহাত দিয়া র‍্যাঁদা চালায়—আবার গানও করে। গায়ের রঙিন্ আল্‌খেল্লার উপর প্রভাতের রৌদ্র আসিয়া লাগে, কোঁক্‌ড়ানো বাব্‌রি চুলের গোছা বাতাসে উড়ে।

জাত বোরেগী; গলাও মিষ্টি—চেহারাও মন্দ নয়; গান গাহিয়াই হয়ত সে তাহার দিন-গুজ্‌রান্ করিতে পারে,—বাপ্-পিতামহ অন্তত তাহাই করিয়াছে।

কিন্তু ছেলেবেলা হইতেই অবিনাশের ঝোঁক—সে কাঠের কাজ শিখিবে; গান গাহিয়া দোরে দোরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ানো কাজ তাহার নয়।

কাঠের কাজ সে শিখিয়াছে ভাল। অবিনাশের হাতের তৈরী ঘরের কাঠাম নাকি ঝড়ে উড়ে না। গাড়ীর চাকা নাকি লোহার মত শক্ত হয়।

কিন্তু গান সে গাহিবে না বলিলেই গান গাওয়া তাহার বন্ধ থাকে না। চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনের দিনে অবিনাশের আল্‌খেল্লায় গোলাপী রংএর আমেজ ধরে,—বাব্‌রি চুলের উপর গুলঞ্চের মালা দোলে। পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া গোপীযন্ত্র লইয়া সারাদিন সে গাঁয়ের পথে গান গাহিয়া বেড়ায়।

সারা ভাদ্রমাসটা ত তাহার কাঠের কাজ একরকম বন্ধই থাকে। উপর-পাড়ার মেয়েরা আসিয়া তাহাকে দলে-দলে ঘিরিয়া বসে। সংক্রান্তির দিন ভাদু পূজা। নতুন নতুন গান তাহাদের তৈরী করিয়া দিতে হয়।

কিন্তু সে বছর হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে—

বৌ ছিল সুন্দরী। আর ওই বৌকে লইয়াই অবিনাশের যা-কিছু সব।

...বৌ বলিত, "ওগো ছাড়ো ছাড়ো, তোমার ও আল্‌খেল্লা ছাড়ো—"

অবিনাশ হাসিয়া বলিত, "কেন, এ ত বেশ।"

"আ-মর্! সন্নেসী হবে নাকি?"

হাসিতে হাসিতে সুন্দরী কপাটের আড়ালে মুখ লুকাইত। আপেলের মত চক্‌চকে রঙিন্ দুটি গাল। হাসিলে তাহাতে টোল্ খায়। পাৎলা দুটি ঠোঁটের ফাঁকে ডালিম-দানার মত দাঁতের সারি। ঝালর-ঝাঁপা কালো দুটি চোখ......কবাটের ফাঁকে দেখা যায়।

মন্ত্রমুগ্ধের মত অবিনাশ সেইদিকে চাহিয়া থাকে......

......সে এক দুরন্ত শীতের রাত।

মাটির খাপ্‌রায় গন্‌গনে কাঠের আগুন মেঝের উপর নামানো। দুপাশে দুজন। একপাশে অবিনাশ, আর একপাশে তার বৌ।

চোখে-মুখে ঘোম্‌টা চাপা দিয়া বৌ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "না—"

অবিনাশ হাত বাড়াইল।

আঁচলটা ছাড়িয়া দিয়া বৌ একটুখানি সরিয়া গিয়া বলিল, "নাঃ, মুখেই তোমার! ভালো ত' বাসো না—"

অবিনাশ বলিল, "বাসি না?"

"ছাই বাসো!"

"বাসি না?"

"না।"

"বাসি না?"

বৌ চুপ করিয়া রহিল।

একটুখানি থামিয়া অবিনাশ বলিল, "দেখ্‌বে?"

"না।"

"দেখ্‌বে তবে?"

বৌ বলিল, "কি দেখ্‌ব?"

"দেখ—"

জলন্ত আগুনের খাপ্‌রার মাঝে অবিনাশ তাহার বাঁহাতের একটা আঙুল ডুবাইয়া দিল। চোখদুটা বড় করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া একদৃষ্টে সেইদিকে সে তাকাইয়া রহিল। পড়্‌ পড়্‌ করিয়া চামড়া পোড়ার গন্ধ উঠিতেছিল। হাঁ হাঁ করিয়া বৌ একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হাতটা তখন তাহার টানিয়া তুলিল—আঙুলটা তখন পুড়িয়া গেছে।

আঙুলে ঘা হইল, ফোস্কা পড়িল,—দেখিতে দেখিতে আবার সারিয়াও গেল। রহিল মাত্র সাদা একটা পোড়া দাগ।

দাগটা এখনও আছে।

বাঁহাতের সেই আঙুলটার দিকে অবিনাশ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে—আর ভাবে......

......সেই বৌ তাহার পালাইয়া গেছে।

কিন্তু খোঁজ-খবর কিছুই করা হয় নাই। নামো-পাড়ার গোষ্ঠ চৌধুরীকেও সেইদিন হইতে দেখা যায় না। বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান্‌—রংটাও খুব ফর্সা! গাঁয়ের লোকে বলাবলি করে,—কাজটা তাহারই। কিন্তু অবিনাশ সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না—চুপ করিয়াই থাকে।

মেয়েগুলা আসে।

অবিনাশ তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া বলে, "কি চাই? গান?"

ছোট মেয়েটা ঘাড় নাড়িয়া বলে, "হ্যাঁ অবি-দা, খুব ভালো-ভালো......"

অবিনাশ ঈষৎ হাসিয়া উদাস দৃষ্টিতে সুমুখের কুলগাছটার দিকে একবার তাকায়। তাহার-পর আপনমনে হুঁকা টানিতে সুরু করে। গোঁফের ভিতর দিয়া সাদা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাতাসে মিশিয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে হুঁকাটা সে দরজার পাশে নামাইয়া দিয়া বলে, "কই তোরা গা দেখি একটা—শুনি!"

মেয়েগুলা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে থাকে।

বড় মেয়েটা মনে-মনে লজ্জা পাইয়া একটুখানি সরিয়া দাঁড়ায়। অবিনাশ একদৃষ্টে তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে।

আরও লজ্জা পাইয়া মেয়েটা উঠানে গিয়া নামে; বলে, "আয় লো আয়, ও দেবে না।"

"হ্যাঁ, সেই ভালো! বৃষ্টি নাম্‌বে,—যাও বাড়ী যাও সব!"

হাসিতে হাসিতে হুঁকাটা অবিনাশ আবার তাহার হাতে তুলিয়া লয়।

নিরুপায় হইয়া মেয়েগুলা উঠানে গিয়া নামে। ছোট মেয়েটা আশা ছাড়িতে পারে না। মুখ ফিরাইয়া বলে, "কাল আসব কিন্তু—বলে' যাচ্ছি, হ্যাঁ—।"

তামাকের ধোঁয়ার ভিতর অবিনাশের চোখদুইটা

দেখিতে পাওয়া যায়। কি বলে না বলে কিছুই বুঝা যায় না।

খানিকদুর আসিয়া ছোট মেয়েগুলা বলাবলি করে, "অবি-দা ভাই ক্ষেপেছে—ঠিক্ !"

একটা ফাজিল-মেয়ে আর-একটা মেয়েকে কাছে টানিয়া তাহার কানে-কানে বলিয়া ওঠে, "বৌ পালিয়েছে যে !"

বলিয়াই ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে।

অবিনাশের ঘরে তাহারা প্রায়ই আসে,—পশু, কেবল ও সতীশ। উঠানে কুলগাছের তলায় কাঠের একটা ঢেঁকি পড়িয়া থাকে, বৃষ্টি যেদিন না হয়, তাহার উপর বসিয়া বসিয়া তাহারা তামাক টানে আর গল্প করে। বৃষ্টির দিনে চালায় উঠিয়া বসে।

কেবল সেদিন আগেই আসিল ; হাতে একটা হুঁকা, পায়ে একপা কাদা। লোকে বলে, কেবল নাকি ভারি কৃপণ, ঘরে তামাক খায় না, পাছে খরচ হয় ; ছোট এই হুঁকাটি তাই সে সর্ব্বদাই হাতে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ; যেখানে কাহাকেও তামাক খাইতে দেখে সেইখানেই দাঁড়ায়, কলিকাটা চট্ করিয়া নিজের হুঁকার উপর বসাইয়া লইয়া বারকতক্ খুব জোরে জোরে টানিয়া লয়। দুপুরে ভাত খাইয়া সে আর কোথাও দাঁড়ায় না, গ্রামের এক প্রান্ত হইতে হুঁকাটি হাতে লইয়া অবিনাশের ঘরে তামাক খাইতে আসে।

পায়ের কাদাটা সে উঠানের ঘাসের উপর মুছিতে মুছিতে বলিল, "পাঠক-বেটারা এমনি পাজি, খানিকটা মাটি ভরাট করে' দিলেই যে দোরের ওই কাদাটা মরে, তা আর করবে না কোনোদিন।"

চালায় বসিয়া একটা কাঠের উপর অবিনাশ ভ্রমর ঘুরাইতেছিল ; মুখ তুলিয়া চাহিল কিন্তু কথাটার কোনও জবাব দিল না।

উঠানের উপর কুল গাছের ভিজা পাতাগুলা রোদের আভায় চিক্ চিক্ করে। কেবল একবার সেই দিক পানে তাকাইয়া বলিল, "রোদ উঠেছে! বাঃ! দেখেছ অবিনাশ? ও একেবারে অব্যথ! জানি যে আমি!"

বলিয়াই সে অবিনাশের কাছে আসিয়া বসিল।

"কই হে, তামাকের ডিবেটাত' এখানে নেই?"

ডিবের সন্ধানে কেবল একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া আবার বলিল, "তা সহজে কি আর পুঁত্‌তে চায়? বেটা বলে, না ঠাউর, কুষ্টোব্যাধি হবে। বলি—ধো বেটা তাঁতি! চাই তবে আর কাকে বলেছে! লোকের ঘর-দোর পড়ছে, গরু-বাছুরের হায়রানির একশেষ। বাটা পুঁতলে বাদলটা যদি থামে ত' দে না বাবা পুঁতে! মায়ের একটি ছেলে—তুই না পুঁতলে হবে না, তাই এত খোসামুদি, নইলে বয়ে গেছে কেবল ঘটকের......আমার কি? আমার না আছে গরু, না আছে বাছুর। বাবাঃ! ভাগ্যিস্ হাতে পায়ে ধরে' পোঁতালাম, নইলে এ বাদল আর ছাড়তে হয় না!"

তামাকের ডিবেটা তখনও সে খুঁজিয়া পায় নাই, আপন মনেই বকিতে বকিতে আবার সে ডিবের সন্ধান করিতে লাগিল,—"দেখেছ? দামোদরের চেহারা খানা দেখেছ একবার অবিনাশ? দুদিনেই ফুলে-ফেঁপে ঢাক-ঢগুর হয়ে গেল!"

ভ্রমরটা থামাইয়া অবিনাশ একবার সুমুখের পানে তাকাইল। গ্রামের শেষ সীমান্তে উঁচু একটি ঢিপির উপর অবিনাশের এই ঘরখানি নদীর একেবারে কিনারায় বলিলেই হয়।

তিনদিন পরে, রামদেও পারিয়ার জমা-বন্দোবস্তী ঘাটে সেদিন খেয়া চলিতেছিল। নৌকাটি তখন দামোদরের ঠিক মাঝখানে ছোট একটি কলার মোচার মতই টলমল করিতেছে। ও-পারের শহরের যাত্রী বোধ করি এ-পারে আসিতেছিল। নৌকার উপর সারি সারি কয়েক-খানা টিন বোঝাই করা হইয়াছে ; তাহার উপর সূর্য্যের আলো আসিয়া পড়ায় সেদিকে আর তাকানো যায় না।

এমনি আর একখানি নৌকা সেদিন যাত্রী সমেত ভরাডুবি হয়। হটুকির ঘাটে সেই অবধি নৌকা চড়িয়া

আর কেহ পারাপার হইতে চায় না; কাজেই খেয়া ঘাট আজকাল একটু খানি দক্ষিণে চাপিয়া ঠিক এই গাঁয়ের পাশেই প্রকাণ্ড শিমুল গাছটার তলায় সরিয়া আসিয়াছে।

"তামাক পেলে?" অবিনাশ বলিল, "এই দেখ এইখানে।"

ঘরের চাঁচর-দেওয়া চালার এক কোণের দিকে আঙুল বাড়াইয়া অবিনাশ দেখাইয়া দিল।

* * *

সবার মুখেই এক কথা।

সতীশ বলিল, "বহুৎ লোকসান হয়ে গেল পশু! ধলা গাইএর সেই বাছুরটা মরে গেল আজ। বাদল ক'দিন না পেলে খেতে, না পেলে চরতে।"

বাছুর মরিলে গরুর দুধ শুকাইয়া যায়; পশু আফিং-খোর মানুষ, দুধের সে একটুখানি বেশি পক্ষপাতী; বলিল, "দুধ কত দিত গাইটা?"

সতীশ বলিল, "তা নাই-নাই করেও সেরখানেক দিত দুবেলায়।"

বাছুর মরার লোকসানটা পশু এতক্ষণে বেশ ভাল করিয়া উপলব্ধি করিল। বলিল, "যে দুষ্কৃতি বাদল, মানুষ মরেনি—এই খুব।"

কলিকায় আগুন চড়াইয়া হুঁকাটা কেবল তখন পড়্ পড়্ করিয়া টানিতেছিল, বলিল, "ডোণ্ট্ কেয়ার! বাদল আর হবে না দেখে নিও তুমি। লখ্‌নাকে বাটি পোঁতা করিয়েছি।"

সতীশ বলিল, "সে ত আমরাই পোঁতালাম রে বাপু, তুই আর কোথা ছিলি তখন?"

কেবল সত্যই সেখানে ছিল না, কথাটা সে কাহার কাছে শুনিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে কোন প্রকারেই স্বীকার করিতে চায় না। বলিল, "ছিলাম না? বাঃ! তোর কথাতেই ছিলাম না!"

চালার নীচে পাথরের পৈঠার উপর বসিয়া পড়িয়া সতীশ বলিল, "মিথ্যেবাদী কোথাকার!"

কেবল লাফাইয়া উঠিল, "খবরদার বলছি, মুখ সাম্‌লে কথা ক' সতে!"

তামাক টানিবার জন্য পশুর বুকের ভিতরটা অনেক-ক্ষণ হইতেই কেমন যেন আই-ঢাই করিতেছিল, এই সুযোগে সতীশের হাত হইতে হুঁকাটা সে টানিয়া লইয়া অবিনাশের পাশে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

এই ঝগড়া-ঝাঁটি চেঁচামেচি গোলমাল জিনিসটা তাহার মোটেই ভাল লাগে না, ক্ষতি বই লাভ ইহাতে কিছু নাই,—অত কষ্টের জমানো আফিংএর আমেজটুকু তাহার দেখিতে-না-দেখিতে কাটিয়া যায়। হুঁকাটা খুব পড়্ পড়্ করিয়া খানিকটা টানিয়া পশু বলিল, "আঃ, কি করিস বাপু তোরা তার ঠিক নেই! বাটি পোঁতা হয়েছে বেশ হয়েছে, তার আবার ঝগড়া-ঝাঁটি কিসের?" বলিয়াই সে আবার বার-কতক টান দিয়া কহিল, "তা বাছুর মরে গেলেও আধসের করে' দেবে দুবেলায়, না কি বল সতীশ? আর সেই যে গয়লারা কি একরকম করে......খড়ের বাছুর তৈরী করে'......তাও করতে পার......"

কিন্তু কথার জবাব দিবার অবসর তখন সতীশের ছিল না, কেবলের দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিল, "মারবি নাকি? তেড়ে লাফিয়ে উঠছিস্ যে ভারি!"

কাঠের উপর আর-একটা ছিদ্র করিবার জন্য অবিনাশ তখন আর এক জায়গায় ভ্রমর বসাইতেছিল। বেগতিক দেখিয়া পশু তাহার দিকে ফিরিল, বলিল, "বিষ্টি আর হবে না—কি বল?"

ভ্রমরের ছড়িটা টানিতে টানিতে অন্যমনস্কের মত অবিনাশ ঈষৎ হাসিল।

কেবল যেন এম্‌নি একটা কিছু খুঁজিতেছিল, সতীশকে ছাড়িয়া দিয়া সে এইবার অবিনাশের দিকে ফিরিল, বলিল, "ওর কাছে ত শুনিয়া ঝুট—কিছুতেই বিশ্বেস নেই। বাটি পুঁতলে জল হয় কখনও?"

হেঁটমুখে কাজ করিতে করিতে অবিনাশ বলিল, "হয়—হয়। তোমরা যাও দেখি এইবার—আমি একটু ধীরে-সুস্থে কাজ করি।"

কথাটা কেবলের ভয়ানক বাজিল। বলিল, "তা এতক্ষণ বললেই হতো। এতগুলো বামুনের ছেলে দুবেলা আসে, অন্য কেউ হলে কেতাত্ত হয়ে যেতো, আর তুই কিনা বল্‌লি—যাও! বেশ!—চললাম। আয় রে আয় সতে, চলে আয়!"

চালা হইতে কেবল পৈঠায় নামিল, কিন্তু তাহার হুঁকাটা তখনও পশুর হাতে। আবার ফিরিয়া গিয়া পশুর হাত হইতে হুঁকাটা একপ্রকার ছিনাইয়া লইয়াই কেবল বলিল, "ওঠ্! আর তামাক খায় না। ঘরে থেগে যা!"

কিন্তু কেহই উঠিল না দেখিয়া কেবলের রাগের মাত্রা আর-একটুখানি বাড়িয়া গেল। হুঁকাটা হাতে লইয়া সে উঠানে গিয়া নামিল। বলিল, "সব শালাকে চিনি আমি। আর ওকেও কিছু চিনতে আমার বাকি নেই। বাটি পোঁতায় বিশ্বেস হয় না,—কেমন? আর মানুষ-করা বৌ চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়—তাতে বিশ্বেস হয় ত?"

কেবল চলিয়া গেলে সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "শালা ভারি বদ্।"

পশু বলিল, "যত রাগ শেষে অবিনাশের উপরেই ঝেড়ে গেল।"

অবিনাশের ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি শুকনো হাসি দেখা দিল। কিন্তু সে তখন মনের ভুলে কাঠের উপর আর একটা ছিদ্র করিয়া ফেলিয়াছে।

ক্রমশ—

বারাঙ্গনা

ম্যাক্সিম্ গোর্কি

পেকারে (চায়ের দোকানের নাম) বসিয়া একদিন একটি তরুণীর সহিত কথা কহিতেছিলাম। মেয়েটি নেভ্‌স্কি হইতে আসিয়াছে।

সে বলিল,—

আপনার এই বইখানা বিখ্যাত ব্লকের লেখা—না? আমিও তাঁকে জানতাম—যদিও মাত্র একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।......

শরতের রাত, চারিদিকে ভিজে সাঁৎসেতে কুয়াসা,—সে যে কি তা ত আপনি জানেন,—ডুমার ঘড়িতে তখন বারটা বেজেছে। বড় ক্লান্তি বোধ করছিলাম, বাড়ীর দিকে যাব বলে ঠিক করেছি—এমন সময় হঠাৎ ইটালিয়ান্‌স্কার কোণ থেকে একটি চমৎকার পোযাক-পরা লোক বেরিয়ে এলেন, এবং আমায় তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে আহ্বান করলেন। ভারি সুন্দর দেখতে তিনি! মুখের মধ্যে এম্‌নি তেজ—আমার মনে হ'ল বিদেশী।

হেঁটেই চল্‌লাম। বেশী দূর নয়—দশ নম্বর ক্যারা-ভেনিয়া, প্রেমিক-প্রেমিকার লীলা-নিকেতন! চলতে চলতে আমি তাঁর সঙ্গে কথা কইতে লাগলাম, কিন্তু তিনি সে-সবের কোনও জবাব দিলেন না। আমার কেমন অস্বাভাবিক লাগল—অস্বস্তিও হ'ল।......পুরুষ যখন কঠোর হয় তখন ভারি বিশ্রী লাগে......

সেখানে পৌঁছলাম। পৌঁছেই চা আনতে বললাম। কিন্তু বেয়ারা সেই যে গেল, আর ফেরে না। তখন তিনি তাকে ডাকবার জন্যে হলের দিকে গেলেন। আমার অত্যন্ত ক্লান্তি ও শীত বোধ হতে লাগল—সোফার উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তার পর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখি, আমার উল্টো দিকে হাতে মাথা

রেখে টেবিলের ওপর কনুই দিয়ে ঝুঁকে আমারই পানে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি,—দেখ্‌লেই ভয় হয়, এম্‌নি চাহনি।

আমার কিন্তু একটুও ভয় হ'ল না। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে বরং লজ্জাই হল। ভাবলাম, 'ইনি নিশ্চয়ই কোনও গাইয়ে-বাজিয়ে। যে কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরী কাটা চুল!' বল্‌লাম, "আমায় ক্ষমা করতে হবে। এত ক্লান্তি ও শীত......"

তিনি অল্প একটু হেসে বললেন, "ওর জন্যে ভেবো না।" বলেই সোফার উপর আমার পাশে এসে বসে, আমাকে কোলের উপর তুলে নিলেন, তারপর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "আরও একটু ঘুমিয়ে নাও।"

সত্যি আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। এম্‌নি চমৎকার ব্যবহার তাঁর! বেশ বুঝছিলুম, বোকামী হচ্ছে, কিন্তু কোনও উপায় ছিল না।

তিনি আমায় ধীরে ধীরে দোলা দিতে লাগলেন। আমার ভারি ভাল লাগল। চোখ মেল্‌লাম। একটু হাসলাম। তিনিও হাসলেন। যতক্ষণ আমায় হাতের ওপর রেখে যত্নভরে দোলা দিলেন, ততক্ষণ ঘুমিয়ে রইলাম।

শেষে তিনি বললেন, "আচ্ছা, এইবার উঠি, এইবারে আমায় যেতে হয়।" বলেই উঠে দাঁড়িয়ে পঁচিশ রুবল্‌ টেবিলে রাখলেন।

আমি বললাম, "শুনুন।—এ কিসের জন্যে?"

আমার কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল,—আগাগোড়াই সবটুকু এম্‌নি নতুন—এম্‌নি মজার! তাঁকে ক্ষমা করবার জন্য বললাম। তিনি একটু হাসলেন, হাতে একটু চাপ দিয়ে সেখানে—সত্যি সত্যি—একটি চুমো দিলেন।

তারপর চলে গেলেন।

বেয়ারাও এল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ওঁকে চেন কি?"

"ব্লক—কবি। এই যে—" বলেই একখানা কাগজে তাঁর ছবি দেখালে।

"হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, উনিই।" মনে মনে ভাবলাম, "হা ভগবান, কি বোকার মতই না এতক্ষণ করলাম!"...

অনুবাদক—মুরলীধর বসু

ভবিষ্যতের ভার

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই-এর বয়স অনেক হয়েছে—ষাটের চেয়ে সত্তরের কাছাকাছি। দড়ির মত পাকানো লম্বা দেহটি, সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছে। আজকাল গোঁফ-চুল সবই পেকেছে। চোখ বুজিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বল্লেন, "আপনাকে নিয়ে এই পোনেরো জন হেড মাষ্টারকে আসতে যেতে দেখলাম। আজকের কথা ত নয়—এ ইস্কুল সবে তখন আরম্ভ হল। দশআনির বড় কর্ত্তা তখন বেঁচে, ভারী ভালো ছিলেন! সেক্রেটারী তখন অনাথবাবু কিনা, তাঁকে ডেকে বল্লেন, 'আমার এই বার বাড়িটা ত পড়েই থাকে, এর দুটো ঘরে তোমাদের ইস্কুল হয় না, হ্যাঁ?'

সেই বড় বড় দুটো ঘর নিয়ে ইস্কুল আরম্ভ হল! সেকি আজকের কথা, এই এক-চল্লিশ বছর হল!"

চোখ বুজিয়ে শীর্ণ মাথাটি একটু নুইয়ে একধারে

কাৎ করে’ বলা পণ্ডিত মশাই-এর অভ্যাস। মুখখানা যৌবনে কি রকম ছিল এখন দেখে কিছুতেই কল্পনা করা যায় না। এক একজন লোকের যৌবন ছিল বলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তারা যে-ভাবে জীবন আরম্ভ করে, শেষ যেন তেমনি করেই করে।

দেহে বা মুখে অতিরিক্ত মাংস পণ্ডিত মশাই-এর এক রত্তিও নেই। কোনও কালে ছিলও না বোধ হয়। তা’হলে চামড়া শিথিল হয়ে দু-একটা আরো রেখা মুখে দেখা যেতো বোধ হয়।

প্রথম দেখলে মনে হয়, সে মুখ সদা-প্রসন্ন। বিশেষ লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সে প্রসন্নতা মনের নয় মুখের মাংসপেশীর মাত্র।

পণ্ডিত মশাই বলে’ যাচ্ছিলেন, “গবর্ণমেন্টের ইস্কুল হলে এতদিন কবে পেন্‌সান পাবার কথা। ইস্কুল ঠাঁই নাড়া হলই ত ছ’বার।”—কথা কইতে কইতে পণ্ডিত মশাই-এর টিকেটা নিবে এসেছিল। চোখ চেয়ে তিনি তাতে আবার ফুঁ দিতে সুরু করলেন।

টিফিনের সময়ে মাষ্টারদের বিশ্রাম করবার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। ঘরটি শুধু মাষ্টারদের—বিশ্রামের যতটা হোক বা না হোক শয়ন আহারাদির বটে। ছোটো দুটো বেঞ্চি জুড়ে এক পাশে সেকেণ্ড পণ্ডিত অন্য পাশে ফোর্থ পণ্ডিত মশাই-এর শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলেদের জল-খাবার কলসীটাও ঘরের এককোণে থাকে,—আজ বাইরে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বহুদিন বাসি জল না ফেলায় ও কেউ তদারক না করায় নাকি এত বেশী পোকা হয়েছিল যে, ধমক দিয়েও ছেলেদের জলে পোকা হবার নালিশ বন্ধ করা যায় নি। অবশেষে কাল থেকে কলসীটাকে রোদে দেওয়া হচ্ছে। ঘরের এক দেওয়াল থেকে আর এক দেওয়াল পর্য্যন্ত পেরেক পুঁতে দড়ি খাটান। তাতে পণ্ডিত মশাইদের ক’টি ময়লা ছেঁড়া কাপড় জামা ঝুলছে। সংখ্যায় সেগুলি অত্যন্ত কম, তাদের নতুন বলে ভ্রম করবারও কোন উপায় নেই।

সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই বাইরে কোন ছাত্রের বাড়ী পড়িয়ে খেয়ে আসেন।

ফোর্থ পণ্ডিত মশাই-এর খাবার ব্যবস্থাটা এইখানেই হয়। এক কোণে লোহার একটা তোলা উনুন, ক’টা অত্যন্ত নোংরা কলঙ্ক-পড়া পেতলের থালা বাটি বাসন ও গোটাকতক তরকারীর খোসা পড়ে আছে। ঘরের মেজের সিমেণ্ট অধিকাংশ জায়গায় উঠে গেছে—জঞ্জাল ও ধূলো নির্ব্বিঘ্নে বহুদিন ধরে সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে—তাদের সে আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা সম্প্রতি আছে বলে মনে হয় না।

ফোর্থ পণ্ডিত মশাই-এর রান্নার দৌলতে এক ধারের দেয়াল কড়িকাঠ ও ছাদ ধোঁয়ায় কালীতে স্থায়ীভাবে রঞ্জিত। অন্যান্য অংশে কালী না থাকলেও ঝুলের অভাব নেই। বিছানাটি জোড়া-বেঞ্চির একধারে গুটিয়ে রেখে ফোর্থ পণ্ডিত মশাই কাপড় সেলাই কচ্ছিলেন। বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না করেই বল্লেন, “কাপড়ের দরটা তবু কিছু নেমেছে, কি বলেন?”

কেউ কিছুই বল্‌ল না। ফোর্থ পণ্ডিত মশাই উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করে সেলাই করে চললেন।

লোকটাকে সবাই একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে—এমন কি নিরীহ সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই পর্য্যন্ত। চোহারাটি তাঁর ভক্তি বা সম্ভ্রম উদ্রেক করবার মত নয় বটে। মাথায় খাটো, চৌকোণা দেহটি মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত আগাগোড়া কালো কালো বড় বড় লোমে আচ্ছন্ন—মুখে খোঁচা খোঁচা সুবৃহৎ গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল। এই লোমশ কদাকার দেহটি তিনি আবার সর্ব্বদা অনাবৃতই রাখেন—ধুতি ছাড়া আর কিছু তাঁর গায়ে কদাচিৎ দেখা যায়। ক্লাশে পড়াবার সময় এক জোড়া খড়ম পায়ে থাকে বটে। কথা বেশী তাঁকে বলতে শোনা যায় না, কিন্তু যে ক’টি কথা কন্‌ তার অধিকাংশই অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্দেশ্যহীন। কথা বলার পর নিজেই বোধ হয় নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় লজ্জিত হন। কথাটা যেন তিনি বলেন নি, এমনি ভাব দেখাবার চেষ্টা করেন তখন।

লোকটির মুখে একটা সশঙ্ক দীনতার গভীর ছায়া আছে, নিজের ও পরের কাছে সর্ব্বদাই যেন তিনি কি লাঞ্ছনা আশঙ্কা করছেন।

টিকে বেশ ধরে উঠেছিল; প্রস্তুত কল্‌কেটি হুঁকোর মাথায় চড়িয়ে হাতটি এগিয়ে দিয়ে সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই বল্লেন—"নিন্ মশাই!"

বল্লাম, "মাপ করবেন।"

হেড পণ্ডিত মশাই পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে বল্লেন, "তামাক খান না, ওই সিগারেটগুলো খান ত! ও-গুলোর কাগজ যে মশাই থুতু দিয়ে জোড়ে—তা জানেন? সব ওই মেম মাগীদের থুতু—"

ঘৃণায় এক ধাবড়া থুতু পণ্ডিত মশাই ঘরের দেয়ালেই ফেল্লেন। তার পর হুঁকোর খোলটি ডান হাতের কর্কশ চেটো দিয়ে মুছে একটি টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বল্লেন—"পায়েস ছেড়ে আমানি!"—পণ্ডিত মশাই সকল দিক দিয়ে আদর্শ স্কুলের পণ্ডিত! কোন খুঁত নেই, বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু বেশী হবে হয়ত, কিন্তু মনের বয়স তাঁর নিরূপণ করা কঠিন। সে-মন তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে কোন্ বৃদ্ধ-প্রপিতামহের সঙ্কীর্ণ জগৎ থেকে বহন করে এনেছেন! পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি সে-মনের সমস্ত ঘৃণা ও দম্ভস্ফীত অন্ধতাকে লালন করেন।

যে বর্ত্তমান পদে পদে তাঁর জগতের সব কিছুর মূল্য পাল্টে দিচ্ছে, তার ভালো মন্দ সব কিছুকে নির্ব্বিচারে দাঁত খিচোনই তাঁর এক মাত্র সুখ। রক্তহীন শীর্ণ চেহারা; দীর্ঘকালের অজীর্ণ রোগ ও এই বিদ্বেষ মিলে মুখে একটা স্থায়ী বিরক্তির ছাপ এঁকে দিয়েছে। জুতো পায় দেন না—জামা গায় দেন না, উড়ুনি ও চাদর সম্বল। মোট কথা কঠোর ভাবে তিনি ব্রাহ্মণের সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করেন। এবং সে জন্য তাঁর অহঙ্কারের সীমা নেই।

হুঁকোয় আরও দুটো টান দিয়ে বল্লেন, "তার চেয়ে বিড়ি ভাল!—ও ম্লেচ্ছর থুতু খাওয়ার চেয়ে ভাল!"

'A lot you know'—সেকেণ্ড মাষ্টার মশাই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সিগারেট সমেত ঠোঁট দুটি এক পাশে ফাঁক করে বল্লেন, "কি জানেন সিগারেটের? Have you any idea? কলে মিনিটে হাজার হাজার তৈরী হয়ে আসছে—untouched by hand—একি আপনার নোংরা হাতে গুড় আর তামাক পাতা চটকান!"

সেকেণ্ড মাষ্টার মশাইয়ের বয়স অল্প! যেমন বেঁটে তেমনি রোগা! ভাঙ্গা গালে ও বসা চোখে ঠুলির মত বড় গগল চশমাটা অত্যন্ত বিসদৃশ দেখায়। পা ফাঁক করে হাত পেছনে নিয়ে দাঁড়ালে ঠিক মর্কট বলে ভ্রম হয়। কিন্তু তাঁর পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান নাকি অসীম এবং সে জ্ঞানের পরিচয় তিনি সুযোগ পেলে কখন দিতে ছাড়েন না।

হেড পণ্ডিত মশাই চটে গিয়েছিলেন!—এক ধারের ঠোঁট ঘৃণাভরে একটু তুলে নোংরা কালো ক'টি দাঁত বার করে বল্লেন, "আপনি কি বিলেত গিয়ে দেখে এসেছেন? ওদের বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত ত দৌড়! ওরা সব ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির—সব ছাঁকা সত্যি কথাগুলি আপনার মত ভক্তদের জন্যে লিখে রেখেছে! বেদ মিথ্যে হবে তবু বিলেতে ছাপা বিজ্ঞাপন সে কি কখন মিথ্যে হতে পারে?—রামঃ—!"

সিগারেট আমি খাই না, সে কথা জানিয়ে তখন আর লাভ নেই।

তর্ক অনেক দূর চলত হয়ত! কিন্তু ছেলেগুলো হুড়-হুড় করে ঘরে এসে ঢুকে পড়ল।

"স্যার! টিফিনের ঘণ্টা হয়ে গেছে স্যার! তবু ফণে ঘণ্টা বাজাতে দিচ্ছে না স্যার!"

হাঁপাতে হাঁপাতে নালিশটুকু শেষ করে ছেলেটা সমস্ত মাষ্টারদের মুখের দিকে চেয়ে হাঁ করে রইল।

থার্ড পণ্ডিত মশাই দেহের তুলনায় অত্যন্ত অপরিসর একটি বেঞ্চের ওপর শুয়ে এতক্ষণ নাক ডাকিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছিলেন, স্থূল দেহভার অতি কষ্টে তুলে চোখ রগ্‌ড়ে বল্লেন—"সব হাড় ভেঙ্গে দেব' পাজী

কোথাকার, গোলমাল কিসের রে!"—তারপর আবেষ্টনটা স্মরণ হওয়ায় আমাদের দিকে চেয়ে একটু লজ্জার হাসি হেসে বল্লেন, "কি হয়েছে, এঘরে কেন?"

ছেলেগুলো এবার সমস্বরে পূর্ব্বের নালিশের পুনরাবৃত্তি করল।

"কই, ঘণ্টা কোথায় দেখি চল্!"

"ফণের কাছে স্যার!"

"চল্, ফণের পিঠের আজ চামড়া থাকবে না।"

এসব কাজে থার্ড পণ্ডিত মশাই-এরই উৎসাহ বেশী; স্থূল শিথিল দেহের সমস্ত মাংসপেশী প্রতি পদভরে নাচিয়ে তিনি ছেলের দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

ফণে স্কুলের দুর্দ্দান্ত বিভীষিকা। প্রতিদিন সে স্কুলের একঘেয়ে ইতিহাসে একটি বিপ্লবের সৃষ্টি করে। সবাই পেছনে গেলাম। দেখা গেল ঘণ্টাটা টেবিলের ওপর যথাস্থানেই আছে। ফণের কোন চিহ্ন নেই। টিফিনের ছুটি মিনিট পোনেরো আগে শেষ হবার কথা।

ক'টা ছেলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে চারিদিক খুঁজে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিলে, "ফণে, স্যার দেয়াল টপ্‌কে পালিয়েছে—বইগুলো স্যার ফেলে গেছে কিন্তু"—ও থার্ডপণ্ডিত মশাই-এর বৃহৎ মুষ্টির গাঁট্টা খেয়ে নীরবে ক্লাশে গেল।

ঘণ্টা বাজল। মৌচাকের মত মৃদুগুঞ্জনের সঙ্গে স্কুলের কাজ আরম্ভ হ'ল।

সহরতলির সামান্য বাংলা স্কুল।

সহরতলিটিও প্রাচীন ও গরীব। যে নগণ্য পাকা বাড়িগুলি এখনও তার গৌরব রক্ষা করে তাদের সবারই অতি জীর্ণ দশা। রাস্তাগুলি অপরিসর ও অপরিষ্কার। এবং তারই ধূলোর ওপর দিয়ে প্রতিদিন সেখানকার তথাকথিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অতিকষ্টে করুণ সহিষ্ণুতার সঙ্গে নগ্ন দারিদ্র্যকে নামমাত্র আবরণে ঢাকবার কঠিন চেষ্টায় যাতায়াত করে।

প্রতিদিন সাড়ে দশটায় ভাঙা স্কুলবাড়ির আলোক-বিরল পাঁচটি ঘরে তাদেরি শ'খানেক ক্ষীণদেহ পুত্র-পৌত্র জীর্ণ মলিন বেশে মানুষের বহুযুগসঞ্চিত জ্ঞান ও বিদ্যার উত্তরাধিকার গ্রহণের উপযুক্ত হবার আশায় এসে জড় হয়।

স্কুলের হেডমাষ্টার। পোনেরো দিন হল কাজে ঢুকেছি।

বাড়িতে মামা বলেন,—"এখন কাজে ঢুকেছিস্ থাক্—নেই মামার চেয়ে কাণামামা ভাল! কিন্তু চারিধারে নজর যেন ঠিক থাকে! যত পারিস অ্যাপ্লিকেশন্ করে যাবি, ষ্টেট্‌সম্যান রোজ পড়িস্ত!"

চুপ করে থাকি।

মামা আরো বলেন, "সাধকরে কেউ কি আর মাষ্টারী করে, বলে দশ বছর মাষ্টারী করলে গরু হয়, বিশ বছরে গাধা! ছেলে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যায়। পাঁচ বছর মাষ্টারী করেছে শুনলে মার্চ্চেণ্ট আফিসে ঢুকতেই দেয় না—"

মামার সব কথা কাণে যায় না। অনেক সুবৃহৎ আশা ও কল্পনা মনকে অধিকার করে থাকে।

স্ত্রী ভাতের থালা রেখে বাতাস করতে করতে হয়ত বলে, "কিন্তু মাহিনে যে বড় কম, চলবেত?"

এবার মুখ খোলে।

"আজকের বাজারে চাকরী করলে, কী এর চেয়ে ভালো করে চলত?

বেলা দশটা থেকে রাত সাতটা পর্য্যন্ত হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে সাহেবের গালাগাল হজম করে না হয় আর ক'টা টাকা বেশী পেতাম। সে না হয় কেমিকেলের চুড়ি পরতে—আর এ না হয় কাচের চুড়ি পরবে একি তার চেয়ে খুব খারাপ চলা হল?"

বলতে বলতে খাওয়া থামিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠি। উমা তাড়াতাড়ি সাগ্রহে মাথা নেড়ে মতে সায় দেয়।

আরও উত্তেজিত হয়ে বলি, "এ কত বড় সম্মানের কাজ!"

"নিশ্চয়ই! তুমি কিন্তু মোটে খাচ্চনা! ও-চচ্চড়ি আবার ফেলে রাখলে কেন?"

"এইযে খাই।"—তাড়াতাড়ি কয়েকগ্রাস মুখে তুলে গিলে ফেলে বলি, "শুধু সম্মান? এ কত বড় কাজ বল দেখি! কেরাণীগিরির সঙ্গে এর তুলনা হয়! না খেতে পেয়ে মরলেও যে এতে সান্ত্বনা থাকবে—কিছু করে মরলাম। এত আর মামা যা বোঝে সেই ছেলে ঠেঙানো নয়। মানুষ জাতটাকে গড়ে তোলবার ভার আমাদের ওপর তা জান? প্রাণ দিয়ে করলে এর চেয়ে বড় এর চেয়ে শক্ত কাজ আর আছে! বিলেতে, তুমি যা বল্লে বুঝবে—শুধু কি করে ছেলেদের শেখান উচিত তাই ঠিক করবার জন্যে কত লোক জীবন পাত করছে! এ ত আর মাটি কাঠ-পাথর নিয়ে কাজ নয়, আসল মানুষ নিয়ে কাজ......"

"ও সেই তোমার আনা ওলটা, বুঝেছ না! খুব ত তেঁতুল দিয়ে একবার সেদ্ধ করে ফেলেছি, আর বোধ হয় লাগবে না—লাগছে কি?"

"না, বেশ লাগছে!"

"তবু লাগছে?"

বিরক্ত হয়ে বলি, "আর কিছুত বোঝ না—বাংলাটা ও কি বুঝতে নেই! বেশ লাগছে মানে ভাল লাগছে।"

... ...
... ...

স্কুলে যাই।

থার্ড পণ্ডিত মশাই গেট্ থেকেই পরম পরিচিত শুভানুধ্যায়ীর মত সুপুষ্ট নাতিলঘু বাঁ হাতখানি কাঁধের ওপর রেখে এক পাশে টেনে নিয়ে যান, ও সুবৃহৎ ফোলা মুখখানি মুখের অস্বস্তিকর রকম নিকটে এনে, হাপরের মত অতি গোপন ফিস্‌ফিস্ স্বরে বলেন, "নতুন এখানে ঢুকলেন ত! হালচালও এখানকার কিছু এখনও জানেন না। তাই একটু সাবধান করে দিচ্ছি!"—সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ আরক্ত চোখ দুটি স্ফীত ও বৃহত্তর হয়ে তাঁর উপদেশ সমর্থন করে।

তিনি বলে যান, "পরের কথায় হেলবেন না মশাই, কারুর কথায় না, এই যে আমি বলছি আমার কথাতেও না, ও আমার কাছে হ্যাঁয়া-কথা,—আমি বলেত আর পীর নই। একেবারে আপ্‌রাইট থাকবেন—আপ্‌রাইট এ্যাজ এ কোকোনট ট্রি। নতুন পেয়ে সবাই একবার বাজিয়ে দেখবে কিনা, দুনিয়ার নিয়মই এই! কিন্তু বোল্ দেবেন্ একেবারে কাটা কাটা—ঢিমে তেতালা কখন নয়,—নেভার্।"

হাপুরে ফিস্‌ফিস্ ক্রমে সুস্পষ্ট হাঁড়ি গলায় এসে পৌছোয়। "একটু ফ্রেণ্ডলি অ্যাড্‌ভাইস্ দিলাম, কিছু মনে করবেন না যেন!" একটি মোলায়েম হাসি দিয়ে মনে করবার সব মুছিয়ে দিয়ে হঠাৎ মুখটা আবার নামিয়ে এনে পণ্ডিত মশাই চুপি চুপি বলেন—"একটা মজা দেখবেন? হট্ করে আজ জিজ্ঞেস করে দেখবেন দেখি সেভেন্থ ক্লাশের রেজেষ্ট্রীতে চোদ্দজনের নাম, আর ক্লাশে পোনেরো জন হয় কি করে! অমনি ঘুরতে ঘুরতে ক্লাশে ঢুকে বেটপ্‌কা জিজ্ঞেস করে বসবেন বুঝেচেন! তারপর দেখবেন রগড়খানা! অনেক মজা আছে মশাই এইটুকুর মধ্যে—বহুৎ রগড়—"

হঠাৎ সুর বদ্‌লে পণ্ডিত মশাই বলেন, "চলুন!"—এবং স্কুলে ঢুকতে ঢুকতে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেন, "সেভেন্থ ক্লাশে, বুঝেচেন! অমনি বেটপ্‌কা জিজ্ঞেস করে বসবেন!"

মনটা দমে যায় একটু হয় ত।

ঘণ্টা বাজে। স্কুল বসে। পাশের ঘরের গোলমালে পড়ান যায় না। উঠে গিয়ে দেখি, সেকেণ্ড মাষ্টার মশাই এসে পৌছন নি; কোন দিনই তিনি সময়ে এসে পৌছন না। ছেলেগুলোকে নিজের ক্লাশে নিয়ে এসে বসাই।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে দু'খানা মোটা মোটা বই হাতে করে সেকেণ্ড মাষ্টার মশাই আসেন, বইগুলোর নাম পড়া যায় এমন ভাবেই টেবিলের ওপর রেখে বলেন, "আপনি আবার কষ্ট করে এ-ঘরে এনেছেন! কিছু দরকার

ছিল না।" বইগুলোর দিকে তাকিয়ে বলেন, "পড়বেন নাকি একখানা? নিন্না ওয়েলসের এখানা নিন্—গর্কির-খানাও নিতে পারেন, যেটা খুশী—! আমার ওসব দু' দু'বার পড়া হয়ে গেছে, তবু আবার পড়ি—স্পেল্ণ্ডিড্ বুকস্! কোন্টা দেব?"

বিনীতভাবে বলি, "এখন পড়বার সময় হবে না।"

বইগুলো তুলে নিয়ে করুণা মিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে তিনি বলেন, "এ-সব বালাই বুঝি নেই আপনার! মন্দ নয়; আমার কিন্তু মীট্ এ্যাণ্ড ড্রিঙ্ক্ মশাই!"

রুগ্ন বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখ ও শীর্ণ খর্ব্ব দেহ দেখলে সে কথা বিশ্বাস হয় বটে!

ছেলেদের ডেকে নিয়ে, দেরী হবার জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে তিনি চলে যান।

দেরী করা সম্বন্ধে কয়েকদিন ধরেই বলব বলব করেও কিছু বলতে পারছি না।

আবার পড়ানয় মন দিই। ফার্ষ্ট ক্লাশের তিনটি মাত্র ছেলে। কুঁজো হয়ে বুড়োর মত মাথা নীচু করে নির্জ্জীবের মত আনমনা ভাবে চুপ করে থাকে। এক এক সময় মিছেই বকে মরছি মনে হয়, কিছুই শুনছে না। চোদ্দ পোনেরো বছর সব বয়স—মুখে জৌলোষ নেই—চোখে জ্যোতি নেই! হঠাৎ নিজের ওপর বিরক্তি ধরে। মনে হয়, আমার শুষ্ক বই-এর ব্যাখ্যার চেয়ে আলো বাতাস ও পুষ্টির এদের ঢের বেশী প্রয়োজন।

তবু পড়িয়ে চলি। কোথা থেকে, থেকে থেকে একটা অত্যন্ত দুর্গন্ধ আসে। ছেলেগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে—নাকে কাপড় দেয়।

"কিসের দুর্গন্ধ বলত?"

ক্ষ্যাপাটের মত একটা অত্যন্ত নোংরা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া কোটের নিঃসঙ্গ বোতামটিকে বাঁহাতে নাড়তে নাড়তে বোকার মত হেসে হড়-বড় করে বলে, "পায়রা পচেছে স্তার! ওই যে পায়রাগুলো আছে স্তার, তাই খোপের মধ্যে পচে গেছে স্তার! প্রায় স্তার, পচে যায়। ভয়ানক গন্ধ স্তার! হোয়াক্ থু!"—ছেলেটা জানালায় গিয়ে থুতু ফেলে। বারান্দায় কার্নিশের ওপর অনেকগুলো পায়রা থাকতে দেখেছি বটে!

উৎকট দুর্গন্ধ! একটা কিছু বিহিত করা দরকার।

মাষ্টার মশাইরা বলেন, "ওখানে কে উঠ্‌বে মশাই! ও অমনি খানিক বাদে গন্ধ আপনিই যাবে'খন।"

বেয়ারাটা বিনা সিঁড়িতে অতদূর উঠ্‌তে পারবে না বলে।

বাইরে যাবার ছুতো করে ছেলেগুলো বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

মাষ্টাররা নাকে কাপড় দিয়ে এসে ওপর দিকে চেয়ে মাথা নাড়েন।

সেকেণ্ড মাষ্টার মশাই রুমাল নাকে দিয়ে বলেন, "রট্‌ন্ প্লেশ, পায়রাগুলো পর্য্যন্ত রট্‌ন্।"

একটা ছেলে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার ও কৌশলের সঙ্গে জানালার গরাদে, দরজার মাথা ইত্যাদি ব্যবহার করে অর্দ্ধেক পথ উঠে গিয়ে বলে, "আমি উঠে পেড়ে দেব স্তার?"

"আমি উঠে পেড়ে দেব স্তার?" ভেংচিয়ে ছড়ি তুলে থার্ড পণ্ডিত মশাই বলেন, "তোমায় কে বাহাদুরী দেখাতে বলেছিল বাঁদর? নেমে এস, দেখাচ্ছি—সব কাজে বাঁদরামি!"

তাঁকে থামিয়ে বলি, "পারে যদি উঠুক্না; আর কোন রকম বন্দোবস্ত যখন হচ্চে না—"

"আস্কারা পায় মশাই!"

ক্ষণে ততক্ষণ কারুর কথা শোনবার অপেক্ষা না রেখে মাথায় গিয়ে উঠেছে। কড়িকাঠের ফোকরের ভেতর হাত ভরে একটা মরা আধপচা পায়রার ছানা বার করে হেসে বলে, "পায়রার ছানা স্তার! পায়রাগুলো হাতে আবার ঠুক্‌রে দেয়!"

ছেলেটা স্কুলের চক্ষুশূল এবং স্কুলের নিরবচ্ছিন্ন শান্তির একমাত্র ব্যাঘাত! তবু ছেলেটার উজ্জ্বল দুষ্টুমি ভরা চোখ দুটি, কেমন যেন ভালো লাগে। নির্জ্জীব স্থবিরতার মাঝে ওই যেন একটুখানি সজীব চঞ্চলতা—!

দুর্গন্ধ পচা পায়রার একটা কিনারা হয়। মাষ্টার ও ছেলেরা আবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। থার্ড পণ্ডিত মশাই যাবার সময় আর একবার ইসারা করে তাঁর কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যান।

একটু ঘুরে দেখতে বেরোই।

সেকেণ্ড মাষ্টার মশাই, বইটা আঙুল রেখে মুড়ে অত্যন্ত অলস ও ঈষৎ বিরক্তিভরে উঠে দাঁড়ান। ছেলে-গুলো লেখা থামিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বলেন, "আমার মেথড্ হচ্ছে কি জানেন্—খালি লেখা, ছেলেদের খালি লিখতে দেওয়া, আমি এই ছ-মাসে এ মেথডে ওয়াণ্ডার্ফুল্ রেজাল্ট পেয়েছি। শুধু মুখে পড়ানর চেয়ে এ ঢের এফেক্টিভ্। চোখ্,কান, ও হাতের সেন্সেসান্ সমস্ত দিয়ে ব্রেণ নলেজটা রিসিভ করে কিনা!" একটু দর্পের হাসি হেসে আবার বলেন, "কাজটাতে একদম আমার লাইকিং নেই যদিও, তবুও মেথড্ অফ্ টিচিং নিয়ে একটু আধটু 'এক্সপেরিমেণ্ট্' করেছি;—আপনি 'ড্যাল্টনের 'মেথড্' সম্বন্ধে পড়েছেন নিশ্চয়!"

শুক্‌নো এক চিম্‌টে মানুষটির ছোট্ট মুখের অর্দ্ধেকের বেশী 'গগ্‌ল'টাই অধিকার করে আছে। ওইটুকু মুখ থেকে এই সব অহঙ্কারের কথা ভারী হাস্যকর লাগে।

বলি, "ছেলেদের 'অ্যাটেণ্ডেন্স'টা এ ক'দিন খাতায় তুলতে ভুলে গেছেন, অনুগ্রহ করে আজ তুলে রাখবেন।"

"ও, 'সরি' মনে ছিল না।"

যেতে যেতে বুঝতে পারি লোকটি অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে আমার দিকে চেয়ে আছেন—।

একই ঘরের দুই প্রান্তে হেড্‌পণ্ডিত ও থার্ড পণ্ডিত মশাইএর ক্লাশ।—টুঁ শব্দটি নেই। দুজনেরি বিশ্বাস তাঁর মত ডিশিপ্লিন্ কেউ রাখতে জানে না এবং প্রত্যেকেই অপরের এই 'ডিশিপ্লিন্' রাখবার ক্ষমতাকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। এক ঘরে দুজনার ক্লাশ থাকলে আর রক্ষে নেই—। দুজনে প্রতিযোগিতা করে ডিশিপ্লিন্ রাখতে সুরু করেন।।

ছেলেরা পাংশু মুখে সভয়ে নিঃশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত টানতে দ্বিধা করে।

নিস্তব্ধ ক্লাশে শুধু দুই পণ্ডিত মশাইএর গলা শোনা যায়—মাঝে মাঝে।

"পেন্সিল ঠুকছে কে রে! শব্দ টব্দ করা চলবে না বাপু; এটা মামার বাড়ী নয়,—ইস্কুল, এদিকে আয় দেখি।"

চপেটাঘাতের শব্দ শোনা যায়।

প্রত্যুত্তরে থার্ড পণ্ডিত মশাই এক পর্দ্দা চড়িয়ে ধরেন,—

"পা দোলাচ্ছিস্ কেন রে কেষ্টা—? কি বলে দিয়েছি আমি কাল? শুধু চুপ করে থাক্‌লেই আমার ক্লাশে সাত খুন মাফ্ হবে না বাপু, এ বড় কঠিন ঠাঁই, হাত, পা, মাথা কিচ্ছু নড়বে না— এখানে একেবারে পুতুলটি হয়ে থাকতে হবে।"

হেড্ পণ্ডিত মনে মনে বোধ হয় এর পাল্টা চাল খোঁজেন।

নিস্তব্ধ ক্লাশ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে।

থার্ড পণ্ডিত মশাই ইসারায় আমায় সে কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেন।

ফোর্থ পণ্ডিত মশাইএর ক্লাশে অত্যন্ত গোলমাল—।

হেড পণ্ডিত ও থার্ড পণ্ডিত মশাইএর শাসনে রুদ্ধবেগ সমস্ত দৌরাত্ম্য সুদ সমেত তারা ফোর্থ পণ্ডিত মশাইএর ক্লাশে মুক্ত করে দেয়।

কেউ মানে না। চারিধারে ভিড় করে দাঁড়ায়। পণ্ডিত মশাই পাখার বাঁট দিয়ে এলোপাথারি প্রহার করে তাড়াবার চেষ্টা করেন। ছেলেদের ভারী একটা খেলা মনে হয় বোধ হয়। পাখার বাঁটের নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে তারা হাসতে থাকে।

"স্যার, নগেন স্যার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে।"

"না স্যার"—অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে নগেন—নিজের জায়গায় গিয়ে হাসে।

অগত্যা পণ্ডিত মশাই ওঠেন, দাঁত খিঁচিয়ে বলেন, "সকলের এক ঘা করে বেত।"—এবং পরক্ষণেই দাড়ি

গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে অকারণ হাসিটুকু প্রকাশ পায়।

ছেলেরা হৈ চৈ করে,—"হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার!" এবং স্বেচ্ছায় হাত বাড়িয়ে হাসে।

পণ্ডিত মশাই পাখার বাঁটের এক এক ঘা করে মেরে যান।

"হ্যাঁরে অনিল, তোর না ফাষ্ট বেঞ্চিতে জায়গা!"

ছেলেরা চীৎকার করে বলে, "হাঁ স্যার, ও একবার মার খেয়েছে স্যার, আবার খাবার জন্যে নেমে এসে বসেছে স্যার—!"

"আর তোকে মারব না ত।"

অনিল অনুনয় করে বলে, "আর একবার স্যার!"

একটা ছেলে চেঁচিয়ে, জানায়,"ওই আপনার ডাল ভিজে গেল স্যার, বৃষ্টি পড়ছে।"

পণ্ডিত মশাইএর ডাল রকে খবরের কাগজের ওপর শুকোয়। তাড়াতাড়ি মার ফেলে পণ্ডিত মশাই ডাল তুলতে দৌড়োয়। সত্যিই বৃষ্টি পড়ছে।

ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে আসি। কিছু বলতে পারি না কেন জানি না। আসবার পথে দেখি, বৃদ্ধ সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই ক্লাসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। মাথাটা চেয়ারের পেছনে কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে। ঘুমন্ত মুখ তাঁর চির প্রসন্নতার আভাস হারিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত ও কাতর দেখায়।

আবার টিফিনে ফণের নূতন কীর্ত্তির তদন্ত করতে হয়। সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাইএর ঘুমোবার সময় সে নাকি—রেজেষ্ট্রী খুলে—সমস্ত অনুপস্থিত চিহ্নগুলি উপস্থিতের চিহ্ন করে দিয়েছে। শুধু নিজের নামটি করেই সে নাকি ক্ষান্ত থাকেনি, অত্যন্ত পরার্থপরতার সঙ্গে ক্লাশের সকলকেই নিজের গৌরবে সমান অধিকার দিয়েছে।

স্কুলের দিন এমনি করে কাটে।

কাপড় কেনাটা এবারে না হয় থাক্—উমা বলে। বুঝি সবই। তিনমাস ধরে অত্যন্ত পুরোণ কাপড় ছুটো সেলাই করে কোন রকমে চালাবার ইতিহাসটাও তার জানি। তবু চুপ করে থাকি। কিছুদিন ধরে আর একটা টিউশনির চেষ্টা দেখছি; এখনো জোগাড় করে উঠ্‌তে পারিনি।

"মুদি কাল আবার এসেছিল, ওর আর কেরাসিন তেলওয়ালারটা দিয়ে দিলেই এখন চল্‌বে। অন্যগুলো ছুদিন দেরী করলে ক্ষেতি নেই।"—একটু হেসে উমা আবার বলে, "খোকার জামার কাপড় আর কিনতে হবে না, তোমার সেই ছেঁড়া সার্টটা থেকে খোকার কেমন জামা করেছি দেখবে?"

অত্যন্ত খুশীর ভাণ করে উমা তাড়াতাড়ি জামাটা এনে দেখায়। হাসিমুখে বলি,—"বা চমৎকার হয়েছে ত! ওই ছেঁড়া জামাটা থেকে এমন সুন্দর হয়? তুমি দেখছি অ্যারেবিয়ান্ নাইট্‌সের যাদুকরী!"

এবার সত্যিকারের আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে, "তোমার সব কথায় ঠাট্টা!"

কিন্তু আনন্দটাকে বেশীক্ষণ রাখা যায় না। কখন দেখি সে উঠে গেছে।

মনে মনে সঙ্কল্প করি, এবার আর একটা টিউশনি জোগাড় করবই।

ম্লানমুখে উমা এক সময়ে বলে, "মামারা আর এখানে আসবেন না, বোধ হয় কিছু মনে করে গেছেন।"

"কেন?"

"যত্ন টত্ন কিছুই ত করতে পারিনি। সত্যি তাঁদের ভাল করে যত্ন না করতে পেরে এমন লজ্জা হ'ত।" বলে উমা একটু হাসবার চেষ্টা করে। তারপর বলে, "তাঁরা ত আর রোজ আসেন না, পাঁচ দশ বছরে একবার! তাও যত্ন করতে পারলাম না!"

সত্যি কথা। কিন্তু যত্ন না করতে পারাতেই মুদির কাছে দ্বিগুণ ঋণ হয়ে গেছে। স্বজনপ্রীতি হয়ত অন্তরের স্বতস্ফূর্ত্ত জিনিষ, কিন্তু তার পরিচয় দেবার সৌভাগ্য সকলের নয়। আত্মীয় স্বজন আসার আনন্দের

পেছনে অত্যন্ত স্থূল অত্যন্ত হীন দুর্ভাবনাটাকে কোন রকম ধমক দিয়েই চেপে রাখবার উপায় নেই।

"তুমি অত ভাবছ কেন বল ত? এমাসে না হয় আর মাসে কাপড় চোপড় কিনলেই ত হবে। ত্রিশটা দিন বই ত নয়—ওমাসে ত আর উপরি খরচ নেই।"

কিন্তু ও মাসেও হয় না।

হঠাৎ ডাক্তার ও ডাক্তারখানার বিল বেড়ে ওঠে।—খোকার অত্যন্ত অসুখ। অনেক কষ্টে সেরে ওঠে।

উমা বলে, "দেখ, এমাসটাও কাপড় না হলে চলে যাবে। সেমিজটায় তালি লাগিয়ে নিয়েছি, কাপড়ের তলায় থাকবে, তালি থাকলেই বা কে দেখতে পাচ্ছে?"

খানিক থেমে বলে, "তোমার জুতো জোড়াটা যেন এবারেও কিনতে ভুলে যেওনা।"

"পাগল হয়েছ! আমি নেহাৎ আহাম্মুক তাই জুতো কিনব বলেছিলুম। হাফ্‌সোল আর হিল লাগিয়ে এই তিনটে জায়গায় তালি দিলে এ জুতোকে আর ছ'মাসের মত দেখতে শুনতে হবে না। কি রকম মজবুত জুতো এ—!"

উমা কি জানি কেন অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে—।

খানিক বাদে বলে, "খোকার একটা বিলিতি দুধ এনো!"

"এই সেদিন বিলিতি দুধ এল, এর মধ্যে ফুরিয়ে গেল! এ রকম খরচ করলে ত পারা যায় না।"—একটু বিরক্তই হই।

মুখ ম্লান করে উমা বলে—"এ রকম আর কি খরচ করি, ডাক্তার তবু কতবার করে খাওয়াতে বলেছিল, আমি ত শুধু সকালে একবার রাত্রে একবার খাওয়াই, আর বাকী ত শুধু অ্যারারুট দিই।"

জোর করে বলি—"ডাক্তাররা ও রকম ঢের বলে। অ্যারারুট বেশী করে দিও। বিলিতি দুধ যখন ছিল না তখন আর এদেশে ছেলে বাঁচত না?"—নিজের বেদনাময় সন্দেহের কাঁটাটাও বোধ হয় ওই দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি।

ইন্‌ফ্যান্ট্‌ক্লাশের ছেলেগুলো বসতে পায় না, মাটিতে বসে। ক'টা বেঞ্চির অত্যন্ত দরকার। ঘরটাও বড় অন্ধকার; পেছন দিকে একটা জানলা ফোটালে ভাল হয়।

সেক্রেটারী মশাই অত্যন্ত ভদ্রলোক, কিন্তু তাঁর হাত নেই। বল্লেন, "বোর্ড থেকে না হুকুম দিলে আমি ত কিছু করতে পারি না।"

অনেক দিন বাদে বোর্ড থেকে সংবাদ এল। জানলাটা সম্বন্ধে এখন কিছু করা যায় না। জানলার পেছনের জায়গাটাই অপরের। তারা বোধ হয় জানলা খুলতে দেবে না। তা'ছাড়া বাড়িওয়ালা থাকেন বিদেশে, তিনি জানলা হয়ত খুলতে চাইবেন না ইত্যাদি অনেক হাঙ্গাম। সুতরাং জানলা খোলা হবে না।

বেঞ্চি সম্বন্ধে কথা এই যে, ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাশের ছেলের সংখ্যার কিছু ঠিক নেই। কখনও বাড়ে কখনও কমে। সুতরাং তার জন্যে স্কুলের টাকার এই টানাটানির সময় বেঞ্চি কেনা সুবুদ্ধির কাজ নয়। অন্য ঘর থেকে একটা নিয়ে চালিয়ে দিলেই হবে।

হয়ত কথাগুলো বিবেচকের মত। কিন্তু মনটা ভাল নেই। কিছুদিন আগেই বোর্ড থেকে এক রহস্যময় আদেশ এসেছে মাষ্টারদের ওপর—আর স্কুলে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের অতিরিক্ত কিছু পড়িয়ে যেন সময় নষ্ট করা না হয়।

প্রথমটা কিছু বুঝতে পারি না। হঠাৎ একদিন মনে হ'ল মাঝে মাঝে বাইরের বই থেকে ছেলেদের আমি গল্প-গাছা বলি বটে। সেটা দোষণীয় ভাবিনি এবং তা লুকোবার কোন চেষ্টাও আমার ছিল না। কিন্তু সে সংবাদ বোর্ডের কাণে হঠাৎ গেলই বা কি করে তাও বুঝতে পারি না।

কিছুদিন আগে ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাশকে একঘণ্টা আগে ছুটী দেওয়ার নিয়ম নিয়েও একটু গোল হয়েছে।

হুকুম এসেছে—"অনুগ্রহ করে প্রচলিত নিয়ম পরিবর্ত্তন করবেন না।"

পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা সম্বন্ধে নতুন প্রস্তাব করতে গিয়েও অমনি বিফল হয়েছি।

থার্ড পণ্ডিতমশাই একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছেন, "আপনারা ছেলে মানুষ—এখনও সরল প্রকৃতির, ওসব সংসারের মার-প্যাঁচত এখনও বোঝেন না। আপনি সরল মনেই গেলেন নতুন বই বদ্‌লাতে, লোকেত আর তা বুঝবে না। তারা ভাবলে, আপনি বইওলাদের কাছে ঘুষ খেয়েছেন। ওরকম খায় যে মশাই! আপনি যে সরল মানুষ তাত আর লোক বুঝবে না......"

সমস্ত গা'টা কেমন যেন রী-রী করে উঠেছে। পণ্ডিত মশাই-এর আকস্মিক অন্তরঙ্গতার কারণও বুঝে উঠতে পারিনি। স্কুলে ঢোকবার প্রথম দফাতেই তাঁর সঙ্গে তাঁর একটা অনুরোধ নিয়ে একটু কষাকষি হয়েছিল।

অনুরোধ না রাখার পরের দিনই তিনি হঠাৎ টিফিনের সময় নিজে থেকেই বলে উঠেছিলেন, "হেডমাষ্টার মশাই বলছিলেন, সব ছেলের নামত রেজেষ্টীতে নেই—সেটাত ভালো কথা নয়।"

অত্যন্ত 'কিন্তু' হয়ে ফোর্থ পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, "দেখুন, এই তিনদিন বাদেই ওর বাপ এসে ভর্ত্তি করে দেবে এই দুদিন অমনি বসছে, অমনি আসে, আমি আর বারণ করতে পারি না......"

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ছিলাম,—"আমি ত এ রকম কোন কথা বলিনি, আপনিইত বরং আমায় এ-খোঁজটা করতে বলেছিলেন থার্ড পণ্ডিতমশাই!"

সেইদিন থেকে পণ্ডিতমশাই একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলতেন। হঠাৎ তাই এই আত্মীয়তা একটু বিস্ময়কর লাগল সেদিন।

টিফিনের ঘণ্টায় বিশ্রাম-ঘরে চুপ করে বসে থাকি। কোথাকার রেলভাড়া ক'পয়সা কমেছে উৎসাহের সঙ্গে সেই আলোচনা চলে।

পাশে বসে সেকেণ্ড মাষ্টার থার্ড পণ্ডিতমশাইকে কোন্ কোন্ বড় বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর কিরূপ অন্তরঙ্গতা আছে তারই গল্প বলেন। তিনি যে নিজেও একজন সাহিত্যিক এ-কথা সম্প্রতি তিনি প্রকাশ করেছেন এবং এই বিস্ময়কর সংবাদ প্রকাশ হবার পর থেকে নিজের সৌভাগ্য সম্বন্ধে সচেতন সমস্ত স্কুল একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছাড়াছাড়া দু-একটা কথা শুনতে পাই।

"এ ইস্কুলে আর কদিন আছি বলুন......কি জানেন, ক্রীয়েটিভ ওয়ার্কের সঙ্গে এসব কাজ করা চলে না...... কোন রকমে পড়ে আছি বইত নয়......লেখাটা পেইং হতে আমাদের দেশে একটু দেরী লাগে কিনা ..বিশেষতঃ ভালো লেখা......বিলেত হলে কি আর ভাবতে হত! নতুনের কদর কি এদেশে বোঝে......"

এই ছোট্ট শুকনো মানুষটির দৃঢ় বিশ্বাস এদেশ অত্যন্ত নির্ব্বোধ বলেই তার অসামান্য প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান অবিলম্বে দিতে পারছে না। পণ্ডিত মশাইও শোনেন বলে মনে হয় না।

এই নিত্যনৈমিত্তিক একঘেয়েমি অসহ্য বোধ হয়। হাঁপিয়ে উঠি মনে হয়।

ফণেও স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে স্কুল চলে।

তার শেষ কীর্ত্তি পকেটের ভিতর জ্যান্ত হেলে সাপ এনে ক্লাসের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া। থার্ড পণ্ডিত মশাই-এর কাছে বেদম মার খেয়ে তারপর সে আর স্কুলে আসেনি। তার বাপ এসে স্কুলে বলে গেছে—তার নাকি বিদ্যা হবার কোন আশা নেই—সবাই তাই বলে।

দু' একটা ছেলে এসে খবর দিয়েছিল—সে নাকি এবার তার বাপের ব্যবসা দেখবে। সবাই বলেছিল—"বেণের ছেলেত!"

দুটো টিউশনিই গেছে।

খোকার অত্যন্ত লীবারের দোষ হয়েছে। চিকিৎসা চলছে।

আজকাল আবিষ্কার করেছি, রাত্রে শুধু দুটি ছাতু খেয়ে থাকলে শরীর ভারী হাল্কা থাকে, অজীর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

উমা বলে,—"ও-সব সেমিজ-টেমিজ আজকালের ফ্যাসান বইত নয়! বয়স হয়েছে, আর বাপু লজ্জা করে পরতে—তা সেকেলে বলুক আর যাই বলুক লোকে।"

উমার বয়স উনিশ হয়েছে বটে।

সেদিন অতি কষ্টে রাগ সামলেছি।

মাথাটা সকাল থেকে অত্যন্ত ধরা। তবুও পড়িয়ে যাই।

পড়াতে পড়াতে একটি ছেলের প্রতি কেমন সন্দেহ হয়—শুনছে না। জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতে পারে না। ধমক দিয়ে আবার পড়াতে আরম্ভ করি।

হঠাৎ চোখে পড়ে ছেলেটা বই আড়াল দিয়ে অন্য কি পড়ছে।

বই এর পেছনে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ধরা পড়ে!

সমস্ত রক্ত যেন এক মুহূর্ত্তে মাথায় উঠে যায়—

"পাজী কোথাকার! আমার মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে আর তুমি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ছ?—কাণ ধরে হিড় হিড় করে ছেলেটাকে টেনে নিয়ে আসি।

নিজের পৈশাচিক রাগে নিজেই হঠাৎ বিস্মিত হয়ে তাকে ছেড়ে দিই। সামান্য কারণে এমন রাগ ত আমার কখন হত না?

এবার বর্ষাটা বড্ড বেশী দিন ভোগাচ্ছে। জুতোটা আরো দুমাস বেশ পায়ে দেওয়া যেত। বর্ষার জন্যই অনবরত ভেতরে জল ঢুকছে। তাবলে এই কদিন বর্ষার জন্যে এমন জুতোটা ফেলে দিয়ে আবার এক জোড়া কেনা ত আর যেতে পারে না!

সর্দ্দিটা বোধ হয় এই ভিজে পায়ে থাকার জন্যেই বাড়ছে। মাথাটা আজকাল রোজই ধরে। কেমন যেন গায়ে জোর পাইনা।

উমা চিন্তিত ভাবে মুখের দিকে চেয়ে বলে—"তোমার কিন্তু গালের হাড় দেখা দিচ্ছে! তুমি আজকাল মোটে ভাল করে খাও না।"

হেসে তার পিঠ চাপড়ে বলি, "হাড় থাকলেই দেখা যায়—"

স্কুলের শেষ দুটো ঘণ্টা মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে।

ডাক্তার বলেছে, কিছুদিন রেষ্ট নিন না—আপনি সেরে যাবে। বলি, "হ্যাঁ, এইবার নেব ভাবছি—আচ্ছা এর কোন ওষুধ-টোষুধ দেওয়া চলে না ত?"

"কিছু না। শুধু বিশ্রাম আপনি সেরে যাবে।"

ক্লাশে শেষ দুঘণ্টায় কিছুতেই বই খুলে পড়তে পারি না।

আর সত্যিই মাঝে মাঝে লিখতে দেওয়া ত আর খারাপ নয়। লেখাটাও ত দরকার। আমি ত আর ফাঁকি দেবার জন্যে লেখাচ্ছি না—লেখার ভেতর দিয়েও ত ছেলেদের বেশ আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায়! ভেবে চিন্তে লেখার একটা খেলাও ত বার করা যেতে পারে।

ছেলেদের বলি—কে কোন্ অক্ষর নিবি বল্।

"এফ স্যার"—"আর"—"সি"......

"বেশ! আজকের পড়া থেকে নিজের নিজের অক্ষর যে কটা কথায় আছে খুঁজেখুঁজে খাতায় লিখে ফেল দেখি। দেখি কার ভাগ্যে ক'টা অক্ষর পড়ে।"

বেশী করে ছেলেদের আর বোঝাতে হয় না। কদিন ধরেই তারা এ খেলা করছে—জানে। তারা উৎসাহের সঙ্গে বলে, "হ্যাঁ স্যার।"

এইত বেশ লেখার পদ্ধতি! ধরতে গেলে মাথা থেকে বেশ ভাল মতলবই বেরিয়েছে—!

একটা ছেলে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাতা দিয়ে বলে, "আমার 'ওয়াই' ছিল স্যার, হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা এবার 'ই' ধর—

ছেলেরা কি বোঝে জানি না। কেউ আর খাতা নিয়ে আসে না।

* * * *

হঠাৎ ঘণ্টার শব্দে জেগে উঠি।

চমকে দেখি—

ঘুমোচ্ছিলাম...

টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলাম!

বিচিত্রা

হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দের উদ্যোগে সম্প্রতি কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজ প্রাঙ্গনে জনকয়েক খৃষ্টান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। একটি নমঃশূদ্র পরিবার, পরিবারে দুইটি পুরুষ, দুইটি মহিলা; আর একটি বিধবা খাসিয়া মহিলা তাঁহার একমাত্র শিশুপুত্রসহ 'সনাতন' হিন্দুশাস্ত্রমতে পুনরায় হিন্দুসমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সহরের বহু হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হইলে সমবেত হিন্দুগণ নবদীক্ষিতদের হাতে মিষ্টান্ন ও পানীয় গ্রহণ করেন। হিন্দুসমাজের তরফ হইতে এই রকম প্রচেষ্টা বাঁচিবার উপায়। প্রকাশ, উপস্থিত হিন্দুগণ সকলই এই হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখাইয়াছেন। শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। হিন্দু-সমাজ যেন মনে রাখেন, এই সব নবদীক্ষিত হিন্দু পূর্ব্বেও হিন্দু ছিলেন; হিন্দুসমাজের সহানুভূতির অভাবে তাঁহারা স্বসমাজ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। যে সহানুভূতি হিন্দুসমাজে পান নাই সেই সহানুভূতি খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজে পান বলিয়াই না তাঁহারা হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া যান! অবশ্য ইহা সত্য যে, অনেকে প্রলোভনে পড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। সে-ক্ষেত্রেও হিন্দু-সমাজকে সাবধান হইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে। সমাজের সংহতি রক্ষা করিতে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঐ-সকল প্রলোভন হইতে রক্ষা করার দায়ও সমাজেরই।

* *
*

অবশ্য ধর্ম্মের দিক হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বা প্রত্যাবর্ত্তন, মূল্য হীন। শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া যীশুকে বা যীশুকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিবার প্রতিজ্ঞা অথবা অনুষ্ঠান সত্যকার শ্রীকৃষ্ণ বা যীশুর কাছে হয়ত হাসির কথা। কিন্তু প্রত্যেক সমাজের আত্মরক্ষা ও আত্মসম্প্রসারণ জন্য এ[illegible] সকলের প্রয়োজন আছে।

সমাজের সংহতি নষ্ট হইলে সমাজের সভ্যতা এবং সাধনাও নষ্ট হইতে থাকে।

* *
*

কলিকাতায় এবার একটি সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজন হইতেছে। হিন্দু-সমাজের এই ঘরমুখীন দৃ[illegible] আশার কথা। জগদম্বার পূজা করিয়াও যদি হিন্দু মায়ের দেউলে কোটি কোটি নরনারীকে প্রবেশে বাধা দেয়, তা[illegible] হইলে বুঝিতে হইবে, হিন্দুর মাতৃপূজা ব্যর্থ হইয়াছে। এই সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্দেশ্য—ব্রাহ্মণ চণ্ডা[illegible] নির্ব্বিশেষে হিন্দুমাত্রেরই এই পূজা, হিন্দু মাত্রেই এ[illegible] পূজায় যোগ দিতে পারিবে, সকলেই সমবেতভাবে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিতে পারিবে। হিন্দুর সার্ব্বজনীন পূ[illegible] সার্থক হউক। হিন্দু-সমাজের ঐক্য এই দিকেই খুঁজিতে হইবে,—এই পূজা-পার্ব্বণ শাঁক-ঘণ্টা ধূপধুনার মধ্য দিয়া[illegible]

বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, নবশাক, চাঁড়াল, বাগ্‌দী হাড়ি, ডোম, মুচি, তাম্বুলি, নমঃশূদ্র, বৈদ্য-কায়স্থকে হিন্দু হইতে হইবে।

আমাদের মনে হয়, এই ধরণের সার্ব্বজনীন পূজায় ব্যবস্থা আমাদের ছিল। বারোয়ারী পূজাই সার্ব্বজনীন পূজা। যাহা হউক আজ দেশ কাল অনুযায়ী বারোয়ারীর সংস্কার আবশ্যক।

দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিনে বাঙ্গলার প্রতিগ্রামে হিন্দু-সাধারণের একটি সম্মিলনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, এবং তথায় প্রত্যেক হিন্দুর সঙ্গে প্রত্যেক হিন্দু বিজয়ার আলিঙ্গন নমস্কার প্রভৃতির ভিতর দিয়া যেন বুঝিতে পারে, "প্রত্যেকের তরে প্রত্যেকে মোরা।"—হিন্দুর দুর্গোৎসব হিন্দুর জাতীয় উৎসব হউক।

* *
*

দক্ষিণ আফ্রিকার ডেপুটেশন ভারতে আসিয়াছেন; বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। ভারতবাসীদের অবস্থা জানিয়া যাওয়াই এই ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীরা 'পারিয়া' —'পঞ্চম' হইয়া আছে। সেখানকার শ্বেতাঙ্গ ব্রাহ্মণগণ ভারতবাসীদের সমকক্ষ ভাবিতে পারেন না, ভাবিতে গেলে নানা কারণে তাঁহাদের অন্তরাত্মা সঙ্কুচিত হয়। বর্ণ-বিদ্বেষ ও অর্থনীতির স্বার্থ দুই-ই সেখানে প্রবল হইয়া শ্বেতাঙ্গ-সমাজকে সচেতন করিয়াছে। ভারতবাসীর সেখানে 'সসম্মানে' বসবাসের প্রার্থনা তাই পূর্ণ হয় নাই। কোন অন্যায়েরই প্রতিকার হয় নাই। আমাদের হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টও কিন্তু দুই চার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ভবি তাহাতেও ভুলেন নাই। সে যাক্, ভারতবাসীদের দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজে সসম্মানে স্থান দেওয়া যায় কি না, এই তথ্য, জানিবার জন্য ডেপুটেশন আসিয়াছেন। ডেপুটেশন চিরন্তন প্রথামত ভারতবর্ষ বিষয়ে 'জ্ঞান' অর্জ্জন করিতেছেন। কলিকাতার রোটারি ক্লাবে, বেলভিডিয়রে খানা খাইতেছেন, আর ভারতবর্ষের সনাতন আতিথেয়তার প্রশংসা করিতেছেন। অবশ্য নিমন্ত্রিত হইয়া করপোরেশনের আতিথ্যও গ্রহণ করিয়াছেন, বসু বিজ্ঞান-মন্দির মেডিকেল কলেজ প্রভৃতিও দেখিয়া গিয়াছেন,—আর দেখার বাকী কি? ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ (Possibilities) সম্বন্ধেও তাঁহারা তথ্য সংগ্রহ করিবেন। আমাদের হাত থাকিলে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার যাবতীয় মালের উপরই আমদানী শুল্ক চড়াইয়া দিতাম। ভবিষ্যৎ আপনি পরিষ্কার হইয়া যাইত। সে যাহাই হউক, এই ডেপুটেশন আর কি বলিবেন? আমরাই বলি,—আমরা সত্যই দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ-সমাজের সমকক্ষ নহি। আমাদের শিক্ষা সভ্যতা সুপ্রাচীন, আমাদের আচার-ব্যবহার দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ-সমাজ হইতে নিকৃষ্ট নহে, কিন্তু সত্যই আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের সমকক্ষ নহি। আমরা কোথাও সসম্মানে বাস করিবার যোগ্য নহি। কারণ, নিজ বাসভূমে যাহারা পরবাসী তাহাদের সম্মানের স্থান কোথায়? যে দেশের তেত্রিশ কোটি নরনারী পরবশ্যতার আরামে কাল কাটায় সে দেশের লোক সত্যই 'পারিয়া'—'পঞ্চম' থাকিবারই যোগ্য।

আমরা সত্যই তোমাদের সমকক্ষ নহি। তোমরা স্বায়ত্ব শাসনের সম্মানে সম্মানিত, আমরা স্বায়ত্ব শাসন দাবীর মত দাবী করিলে হই লাঞ্ছিত, আমরা সত্যই তোমাদের সমকক্ষ নহি। তোমরা স্বার্থপর, দেশের স্বার্থ বোঝ, আমরা দেশের স্বার্থ বুঝি না। আমরা-অতিথি সেবা চিরকাল করি, পাঠান মোগল ইংরেজ যেই যখন আসে, আতিথ্যের ত্রুটি হয় নাই; অতিথির সম্মান আমরা রাখি, অতিথিকে মাথায় করিয়া রাখি, কিন্তু ঘরের লোককে অপমান করি, পায়ে দলি, সত্যই আমরা তোমাদের সমকক্ষ নহি। সমকক্ষ হইলে আজ তোমাদের এই ডেপুটেশনের আবশ্যক হইত না, অন্তত্র সে কথার মীমাংসা হইত।

আমরা জাত হিসাবে যে কত বড় অসহায় নিরুপায়, তাহাও ডেপুটেশন ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা ও আমাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়া নিয়াছেন হয় ত! যাহারা অসহায়

তাহাদের উপরে অত্যাচার নিরীহ কৃষ্ণাঙ্গ কুলিরাও করে, শ্বেতাঙ্গ কুলিরা অসহায় ভারতবাসীদের নির্য্যাতন করিবে, অভাবনীয় নহে। ডেপুটেশনের ফল কি হইবে সে কথা থাকুক আমাদের অসহায়ত্ব কবে ঘুচিবে ?

* *
*

রেল কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি বেশ উঁচু। নীচদিকে তাঁহারা তাকান না। পূজা উপলক্ষে রেলকর্ত্তৃপক্ষ ভাড়া কমাইয়া থাকেন। কিন্তু এই ভাড়া কমে কাহাদর জন্য ? যাঁহারা ভাড়া কমানোর ইতর-বিশেষ বড়-একটা গ্রাহ্যই করেন না, তাঁহাদের জন্য ; আর যাহাদের একটি পয়সা ভাড়া কমিলে, একমুঠা ভাতের সংস্থান হয়, তাহাদের ভাড়া কমে না।

প্রথম দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া কমিয়াছে ; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমে নাই। অথচ এই তৃতীয় শ্রেণীর ১১১নং যাত্রীরাই বার মাস রেল কোম্পানীর অর্থ যোগায়।

রেলকর্ত্তৃপক্ষের এই অদ্ভুত ব্যবস্থার সমর্থনে যে যুক্তি দেখান হয় তাহা যেমন নির্ম্মম তেমনি যুক্তিহীন।

তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইলে নাকি এত যাত্রী-সমাগম হইবে যে, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ঠাঁই দিতে পারিবেন না।

এতে বুঝা যায় যে, ঐ শ্রেণীতে এমন অনেক আছেন, যাঁহারা ভাড়ার বাহুল্য জন্যই, ইচ্ছা সত্ত্বেও পূজায় দেশে যাইতে পারেন না। ভাড়া একটু কম হইলেই পূজার অবকাশ উপভোগ করিতে পারিতেন। এই কারণেই কি এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমানোই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন নহে ?

সামাল দিতে পারিবেন না, একথার কোনও মূল্য নাই। কারণ, ভাড়া না কমাইয়া তাঁহারা সামাল দিতে পারেন না, বা ইচ্ছা করিয়া দেন না। পূজার ভিড়ে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাও যে দুর্গতি ভোগ করে, তাহা এদেশের মানুষ ভেড়ার পক্ষেই সম্ভব। কর্ত্তৃপক্ষ অতিরিক্ত গাড়ীর বন্দোবস্ত করিলে যাত্রীর দুঃখ দূর করিতে পারেন, ভাড়া কমাইলেও সামাল দিতে পারেন। পূজায় ভিড় কেবল তৃতীয় শ্রেণীতে হয় না, অনুপাতে মধ্যম দ্বিতীয় প্রথম শ্রেণীতেও হয়। তৃতীয় শ্রেণীর লোক সংখ্যা বেশী তেমনি গাড়ীর সংখ্যাও বাড়াইতে হয়। কিন্তু রেলকর্ত্তৃপক্ষের কান যাঁহাদের মুখের কাছে, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর কথা সেখানে পৌঁছায় না।

রেল কোম্পানী এখন সরকারের হাতেই। এদিকে সরকারের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আছে। তবে সরকারী দৃষ্টির angle of vision যতদিন পরিবর্ত্তিত না হইবে ততদিন ১১১নং যাত্রীদের কথা অরণ্যে রোদন।

* *
*

উত্তর কলিকাতার পক্ষ হইতে আগামী কাউন্সিলের সদস্যপদ প্রার্থী হইয়া রাজবন্দী সুভাষচন্দ্র দাঁড়াইয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের দেশ-প্রেম সুভাষচন্দ্রকে মান্দালয়ের কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছে। আমলাতন্ত্রের দৃষ্টিতে তিনি অপরাধী, দেশবাসীর দৃষ্টিতে তিনি দেশ-ভক্ত। সুভাষ চন্দ্রকে উত্তর কলিকাতার ভোটদাতারা নির্ব্বাচিত করিবেন না, এ কথা আমাদের বিশ্বাস হয় না। সুভাষকে নির্ব্বাচন করিলে, রাজবন্দীকালে পর্য্যন্ত তিনি কাউন্সিলে উপস্থিত হইতে পারিবেন না, সেই সূত্রে কংগ্রেস পক্ষ একটি ভোট হারাইবেন একথা সত্য। কিন্তু ভোট সংখ্যার দিক এক্ষেত্রে নগণ্য। সরকার জনমতের বিরুদ্ধে যাঁহাদের শান্তি শৃঙ্খলার অজুহাতে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন দেশবাসী তাঁহাদেরই একজনকে তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া সরকারের স্বৈরাচারের উত্তরে জানাইয়া দিন যে, আমাদের যদি প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে হয়, এই লাঞ্ছিতকেই নির্ব্বাচন করিব, কারণ দেশের সত্যকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে ইঁহারাই যোগ্যতম। বলা বাহুল্য সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়া বিনা বিচারে অবরুদ্ধ সকল রাজবন্দীর প্রতিই দেশবাসী নিজেদের সমবেদনা ও শ্রদ্ধা এবং সরকারী স্বৈরাচারের কথঞ্চিৎ উত্তর দিতে পারিবেন। সকল দেশেই এমন দিন আসে, যখন সরকার যাঁহাদের লাঞ্ছিত করেন, দেশবাসী তাঁহাদের স্বদেশ সেবক বলিয়া সম্মান করেন। সেই সময় এ দেশে আসিয়া পড়িয়াছে।

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক, ৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী,

প্রিয়ের সমাধি

শিল্পী—শ্রীসারদাচরণ উকিল

প্রবাসী প্রেস] ["প্রবাসীর" সৌজন্যে

কালি-কলম

১ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ [৮-ম সংখ্যা

সিন্ধু

প্রথম তরঙ্গ

নজরুল ইস্‌লাম

হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী !
হে অতৃপ্ত ! রহি রহি
কোন্ বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায় ?
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি ?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে ঊর্দ্ধে নীলা, নিম্নে বেলা-ভূমি !
কথা কও, হে দুরন্ত, বল,
তব বুকে কেন এত ঢেউ জাগে, এত কলকল ?
কিসের এ অশ্রান্ত গর্জ্জন ?
দিবা নাই রাত্রি নাই, অনন্ত ক্রন্দন
থামিলনা, বন্ধু, তব !
কোথা তব ব্যথা বাজে ! মোরে কও, কা'রে নাহি কব !
কারে তুমি হারালে কখন্ ?
কোন্ মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন ?
কে সে বালা ? কোথা তার ঘর ?

কবে দেখেছিলে তারে ? কেন হ'ল পর
যারে এত বাসিয়াছ ভালো !
কেন সে আসিল, এসে কেন সে লুকালো ?
অভিমান করেছে সে ?
মানিনী ঝেঁপেছে মুখ নিশিথিনী-কেশে ?
ঘুমায়েছে একাকিনী জোছনা-বিছানে ?
চাঁদের চাঁদিনী বুঝি তাই এত টানে
তোমার সাগর-প্রাণ, জাগায় জোয়ার ?
কী রহস্য আছে চাঁদে লুকানো তোমার ?
বল বন্ধু বল,
ওকি গান ? ওকি কাঁদা ? ঐ মত্ত জল-ছলছল—
ওকি হুহুঙ্কার ?
ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার ?
টানিয়া সে মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল ?
চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ওকি তব ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ওকি রাগ ? ওকি অনুরাগ ?
জাননাকি, তাই
তরঙ্গে আছাড়ি মর আক্রোশে বৃথাই ?...

মনে লাগে, তুমি যেন অনন্ত পুরুষ
আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহুঁশ !
অশান্ত ! প্রশান্ত ছিলে।
এ নিখিলে
জানিতে না আপনারে ছাড়া।
তরঙ্গ ছিলনা বুকে, তখনো দোলানী এসে
দেয়নিক নাড়া।

বিপুল আরসী সম ছিলে স্বচ্ছ ছিলে স্থির,
তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর।—
তপস্বী! ধেয়ানী!
তারপর চাঁদ এলো—কবে, নাহি জানি।
তুমি যেন উঠিলে শিহরি'!
হে মৌনী, কহিলে কথা—"মরি মরি
সুন্দর সুন্দর!"
"সুন্দর সুন্দর" গাহি জাগিয়া উঠিল চরাচর!
সেই সে আদিম শব্দ সেই আদি কথা,
সেই বুঝি নির্জ্জনের সৃজনের ব্যথা।
সেই বুঝি বুঝিলে রাজন্
একা সে সুন্দর হয় হইলে দুজন!···
কোথা সে উদিল চাঁদ হৃদয়ে না নভে
সে কথা জানেনা কেউ, জানিবে না,
চিরকাল নাহি জানা রবে!
এতদিনে ভার হ'ল আপনারে নিয়া একা থাকা,
কেন যেন মনে হয়—ফাঁকা সব ফাঁকা!
কে যেন চাহিছে মোরে, কে যেন কী নাই,
যারে পাই তারে যেন আরো পেতে চাই!···

জাগিল আনন্দ-ব্যথা, জাগিল জোয়ার,
লাগিল তরঙ্গে দোলা, ভাঙ্গিল দুয়ার,
মাতিয়া উঠিলে তুমি!
কাঁপিয়া উঠিল কেঁদে নিদ্রাতুরা ভূমি!
বাতাসে উঠিল ব্যেপে তব হতাশ্বাস,
জাগিল অনন্ত শূন্যে নীলিমা-উছাস।

বিস্ময়ে বাহিরি এল নব নব নক্ষত্রের দল,
রোমাঞ্চিত হ'ল ধরা,
বুক চিরে এল তার তৃণ ফুল ফল।
এল আলো এল বায়ু এল তেজ প্রাণ,
জানা ও অজানা ব্যেপে ওঠে সেকি অভিনব গান।
একি মাতামাতি ওগো এ কি উতরোল!
এত বুক ছিল হেথা ছিল এত কোল!
শাখা ও শাখীতে যেন কত জানাশোনা,
হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেও যেন ছিল জানা
কত সে আপনা!
জলে জলে ঢলাঢলি চলমান বেগে,
ফুলে ফুলে চুমোচুমি—চরাচরে বলা ওঠে জেগে!
আনন্দ-বিহ্বল
সব আজ কথা কহে, গাহে গান, করে কোলাহল!

বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ! স্বপ্নে চাঁদ-মুখ
হেরিয়া উঠিলে জাগি, ব্যথা ক'রে উঠিল ও-বুক।
কী যেন সে ক্ষুধা জাগে, কী যেন সে পীড়া,
গ'লে যায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু শিরা!
নিয়া নেশা নিয়া ব্যথা সুখ
দুলিয়া উঠিলে সিন্ধু উৎসুক উন্মুখ!
কোন্ প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হ'ল তব স্বচ্ছ কায়া!
সিন্ধু ওগো বন্ধু মোর!
গর্জ্জিয়া উঠিলে ঘোর
আর্ত্ত হুহুঙ্কারে!

বারে বারে
বাসনা-তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেয়সীর,
ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানে মায়া, ঊর্দ্ধে প্রিয়া স্থির!
ঘুচিলনা অনন্ত আড়াল,
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল!
কাঁদে গ্রীষ্ম কাঁদে বর্ষা বসন্ত ও শীত,
নিশিদিন শুনি বন্ধু ঐ এক ক্রন্দনের গীত!
নিখিল বিরহী কাঁদে সিন্ধু তব সাথে,
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে প্রিয়া রাতে!
সেই অশ্রু—সেই লোনাজল
তব চক্ষে—হে বিরহী বন্ধু মোর—করে টলমল!

এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া!

চট্টগ্রাম, ২৯-৭-২৬।

ব্যথার পথিক

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

সত্যকে ভুলিয়া থাকিলে সত্য তো ভুলিয়া থাকে না। যতই আপনার ক্ষুদ্র ঘরে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে আপনার নানাবর্ণের মোহন মোহরাশিকে লইয়া মাতিয়া থাকি না, সত্য শত প্রত্যাখানেও মুখভারি করিয়া ফিরিয়া যায় না; একদিন না একদিন সে প্রলয়ের মত আসিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে, তার পর তাহাকে স্বীকার করি আর না-করি হাতটি ধরিয়া সে আবার পথে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়, পথ চলাকে সে কিছুতেই থামিয়া যাইতে দেয় না।

সত্যের এই রুদ্র রূপকে আনন্দের দ্বারা অভিনন্দিত করিতে পারি না, তাই তাহাকে কেবলি বিরূপ মৃত্যুর বেশে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া থাকিতে চাই।

ঘরের সন্ধান নিত্যকাল হইতে মর্ম্মে লাগিয়া আছে। কোথায় সে ঘর? নীহারিকামণ্ডলের কোন্‌খানে?

কোথায় সে পথ? কিছুই জানি না, তাই বুঝি ঘর-বাঁধিবার দুর্নিবার মোহ আর কাটে না। কিন্তু মোহ আবিষ্ট করিতে পারে; নিবিষ্ট করিতে পারে না; আচ্ছন্ন করিতে পারে আমার স্বরূপকে, তাহাকে তো নষ্ট করিতে পারে না।

তাই ব্যক্তির দিকে, বিশ্বের দিকে, একলা মানুষের একলা জীবনের গতির দিকে, সমাজ-সভ্যতার নানা মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কেবলি ঘর-বাঁধা আর ঘর-ভাঙার বিচিত্র লীলা দেখিতে পাই। কবে তাহার চলা সুরু হইয়াছিল জানি না; কিন্তু সেই আদিম মানবের ঘর-বাঁধা হইতে সুরু করিয়া আজিকার উন্নত মানবের ঘর-বাঁধা পর্য্যন্ত কেবলি দেখি ভাঙনের পর ভাঙন। ঘর তাহার আর জুটিল না! ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেও সেই একই যাযাবর ধর্ম্ম। মানুষকে এমন করিয়া না-জানি কে ঘর-ছাড়া করিয়াছে!

সে সর্ব্বনাশা, সে মৃত্যু; কিন্তু সে যে সত্য একথা শত ক্রোধ এবং বিরক্তির দ্বারাও গোপন করিবার উপায় নাই। কোন্ সত্য সে? কি সে বার্ত্তা তাহার?

এই জীবনের পথে যা-কিছু মোহন লোভন সুন্দর, তাকে স্পর্শ করিও না, চিরবর্জ্জনের এই পথ বাহিয়া, চিরবঞ্চনার এই মরুভূ ভেদ করিয়া চল। এই জীবনের গোচর বাহিয়া অগোচরের সন্ধান তোমার, ক্ষণিকের প্রাপ্যকে অগ্রাহ্য করিয়া চিরকালের অপ্রাপ্যকে সন্ধান করিয়া ফিরিতে থাক, মুগ্ধ হইও না, নির্ব্বিকার অন্তরটিকে বহন করিয়া কেবলি চলিতে থাক,—এই কি তাহার সত্য, এই কি তাহার বার্ত্তা? ক্ষুব্ধ মানবাত্মা এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়, উত্তরের প্রতীক্ষাও তাহার নাই যেন!

মধুরই হোক আর নিষ্ঠুরই হোক, ক্ষোভের দ্বারা সত্যকে জানিব কেমন করিয়া?

দেহের রাজ্যে যখন মৃত্যু আসে, তখন তার দুর্লঙ্ঘ্য আদেশে কোথায় যে যাই, কি যে সে তখন বলে তাহা তো বলিতে পারি না। কিন্তু অন্তরের রাজ্যে এই মৃত্যুর সাক্ষাৎ পাই বারে বারে, তাহার কথা কখনো কখনো শুনিতে পাই। এই জীবনের পাওয়াকে যখন সে ছিন্ন করিয়া লয়, তখন বিচ্ছেদ কোন্ কথা বলিয়া যায়?

সে বলিয়া যায় এই চলা ভালবাসার পথে, সত্য; কিন্তু এই ভালবাসা যে পথের তাহাকেও সত্য বলিয়া জান। পথের মাঝে এই যে তোমাদের ভালবাসা, এই যে মিলন ইহাকে ঘরের মায়া দিয়া চিরন্তন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছ, সেই মায়াকে আমি ছিন্ন করি। হে আমার মোহমুগ্ধ, পথিক বন্ধুকে, পথিক বন্ধুর ভালবাসাকে নমস্কার কর। ঘরের ভালবাসার চেয়ে পথের ভালবাসা কম মধুরও নয়, কম সুন্দরও নয়। দূরের যাত্রী, পথ-সঙ্গম পার হইয়া আবার যাত্রা কর, আপন আপন পথের অনুসরণ কর।

ঘরের সন্ধান নাই, তাই ঘরের মায়া দিয়া মন ভুলাইবার প্রয়াস পাই। যতদিন এ মায়ায় আচ্ছন্ন থাকি ততদিন সংসারে বেশ থাকি। আপন আপন সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে নিশ্চিন্ত হইয়া কাটাইতেছি মন্দ নয়। অসীম জগতের অস্তিত্বকে চেতনা হইতে বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের এক একটি নিজস্ব মায়া দিয়া গড়া জগতের মধ্যে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিতে চাই, কিন্তু বিচ্ছেদ, ক্ষতি, শোক, দুঃখ, এই স্বরাজ্য নষ্ট করিয়া দেয়। ভাঙা প্রাচীরের ফাঁক দিয়া অসীম জগতের বিস্তার দেখা দেয়; মায়ার ঘর মায়ার মতই মিলাইয়া যায়, তখন ব্যথার পথখানি জাগ্রত চেতনাকে ডাকে, বলে যাত্রী গো, পথিক গো, এসো এসো, বেলা যে আঁধারে ঢুলিয়া পড়িল, পারের ঘাট যে এখনো দৃষ্টির বাহিরে কোথায় রহিয়াছে তাহার সন্ধানই নাই!

দিনের শেষে বিশ্ব জগতের কর্ম্মপ্রবাহ যখন ক্লান্ত হইয়া শ্রান্তিতে শিথিল হইয়া আসে, বিদায়োন্মুখ সূর্য্যের শেষ আলো যখন সকরুণ ঔদাস্যে প্রকৃতির আকাশ বাতাস শ্যামল প্রান্তরকে কেমন বিষণ্ণ গম্ভীর করিয়া তোলে, তখন সংসার-মায়ায় স্বরূপহারা মানুষের অন্তরের সত্য-পথিকটি যেন ব্যথায় বিবশ হইয়া ওঠে, তাহার এত উৎসাহ-উদ্যম

যেন বৃথা, তাহার যাহা সত্য করিয়া করিবার ছিল, যে পথ তাহার সত্য করিয়া চলিবার ছিল, সে-পথ যেন তাহার কোথায় হারাইয়া গেছে কেমন করিয়া; তাহার যেন কিছুই করা হইল না, এমনি একটি ব্যথার এবং অনুতাপের সুর পূরবী-মূলতানীতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়া সংসারী মানুষেরও অন্তর-আকাশকে বেদনায় ভরিয়া তুলিতে থাকে। তাই দিবা শেষে গ্রামের বধূ জল আনিতে গিয়া থমকিয়া জলের পানে চাহিয়া থাকে, অকস্মাৎ কোথা হইতে কি জানি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার বুক ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়।

এই বেদনা-পথের ডাকে যাহার অন্তর কাতর হইয়াছে, সংসারের ঘরের মায়া তাহাকে বাঁধিতে পারে না, দিগন্তের পারে উদাস দৃষ্টি তাহার বিবাগী হইয়া যায়, সুখের মাঝেও সে স্বস্তি পায় না। দিগন্তের অন্ধকারে হারাইয়া যাওয়া এই নিরুদ্দেশ পথের শেষে কাহার প্রতীক্ষা যে তাহাকে এমন কাঙাল করিয়া পথের টানে কেবলি টানিয়া লইয়া চলে তাহা সে-ই কি জানে? তবু এই উদাস-করা ব্যথাই যেন কোন্ পরশমণির মত তাহার সকল দুঃখকে কোন্ অপূর্ব্ব আনন্দের আভায় উজ্জ্বল করিয়া তোলে। অশ্রু তাহার মুক্তিমন্ত্রের মালা হইয়া উঠে।

তাই সংসারের হাটের পথে যদি কখনো কোনো দৈবে ওই উদাসীর চোখে চোখ পড়িয়া যায়, হাটে যাওয়ার কথা না ভুলিয়া থাকিতে পারা যায় না। যেখানে কেবলই পথ ভুলাইবার ছলনা চলিতেছে সেখানে ওই চোখের উদাস দৃষ্টি হঠাৎ পথের কথা মনে করিয়া দেয়। পথ-ভোলা পথিকের ভালবাসায় মায়া আছে তাহা বাঁধিয়া রাখে, কিন্তু এই উদাসী পথিকের ভালবাসা সব বাঁধন শিথিল করিয়া দিয়া মুক্তির মন্ত্র প্রাণে বুলাইয়া দেয়। তাহার ভালবাসা যেন অসীমের আকুতি, অথই অশ্রুর সায়রে একখানি স্বচ্ছ শুভ্র পদ্মের মত।

বান-ভাসি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ধীরে সুস্থিরে কাজ করিবে বলিয়া অবিনাশ তাহাদের বিদায় করিল বটে, কিন্তু কাজ আর তাহার করা হইল না। হাতের ভ্রমর দেওয়ালের পেরেকে টাঙাইয়া রাখিয়া অবিনাশ উঠিল। উনান আর সেদিন জ্বলিল কই?

নৌকা তখন খেয়া-ঘাটের এপারে আসিয়া লাগিয়াছে।

লোক জনের আনাগোনায় নদীর কিনারে সরু এক ফালি পায়ের দাগ পড়িয়াছিল। এবং সেই সঙ্কীর্ণ পথ-রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া হটুকির হাটের পাশ দিয়া বাঁকুড়া যাইবার পাকা সড়কে গিয়া মিশিয়াছে। অনেকগুলা ধানের মাঠ আর পলাশের একটা জঙ্গল পার হইয়া যাইতে হয়। সে পথ অনেক দূরে।

ও-ঘাটের বোঝাই টিনগুলা তখন এ-ঘাটের সেই সরু পথটির পাশে নৌকা হইতে ধরাধরি করিয়া নামানো হইতেছিল।

অশ্বথ গাছটা নদীর একেবারে নেহাৎ কিনারে ত নয়! এ-পর্য্যন্ত বান প্রায়ই ওঠে না। সেই এক বান-ভাসির সালে উঠিয়াছিল। কিন্তু বানের জোর এ-বছরও যেন ঠিক তেম্‌নি। এত বেশি, যে, অশ্বথের লম্বা বড় বড় কয়েকটা শিকড় পর্য্যন্ত ডুবিয়াছে।

এক পাশের উঁচু একটা শিকড়ের উপর অবিনাশ চুপ করিয়া বসিল।

জায়গাটার নাম শ্মশান-ঘাটা।